ইউনিট-১ অধিবেশন-১

সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা, পরিবার ও সহপাঠী

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করা মানুষের সহজাত ধর্ম। জন্মের পর থেকে শিশু নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সমাজের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালায়। সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে জীবনযাপনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, আস্থা-বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি অর্জন করে থাকে। সমাজের উপযোগী সদস্য হিসেবে এসব গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে পরিবার। পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করে। শিশুর শিক্ষা শুরু হয় পরিবার থেকে। এর পরবর্তী পর্যায়ে শিশু শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে গমন করে। এখানে তার পরিচয় ঘটে সহপাঠীদের সাথে। শিশুর সামাজিকীকরণে তার সহপাঠীরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সমাজের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন এবং সমাজের উপাদানগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।
- সংস্কৃতি কি- তা বলতে পারবেন এবং শিশুর সামাজিকীকরণে সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝায়- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার ও সহপাঠীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক: সমাজের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উপাদান এবং সামাজিকীকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা চোখ বন্ধ করি এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু কীভাবে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে তা দুই মিনিট ব্যাপী কল্পনা করি।

বন্ধুরা, কল্পনায় আমরা কি দেখলাম?

আমরা দেখলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে প্রথমে মা-বাবা তথা পরিবারের আশ্রয় পায়। শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পরিবারের নিয়ম-রীতির সাথে পরিচিত হয় এবং সেগুলো আয়ত্ত্ব করে। এরপর সে পরিবারের গন্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধের সাথে পরিচিত হয়। বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সে ক্রমান্বয়ে এসব আচর-আচরণ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আয়ত্ত্ব করে এবং সমাজের একজন সদস্য হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে সমাজ কী এবং কীভাবে তা গঠিত হয়?

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সাধারণত সমাজ বলতে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝি। শুরুতে সমাজ বলতে মানুষের সব রকম পারস্পরিক সম্পর্ককেই বুঝাত।

ম্যাকাইভার বলেন, "সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপই হল সমাজ।"

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস বলেন, মানুষকে নিয়েই সমাজ, মানুষ পরস্পরের সাথে যৌথভারে মিলেমিশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একত্রিত হয় বা কোন সংগঠন গড়ে তোলে তবে তাকে সমাজ বলে।

সমাজের উপাদানগুলো হলো:

১। সংঘবদ্ধ মানুষ

২। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা

৩। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

৪। সহযোগিতা
৫। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

সামাজিকীকরণ

সামাজিকীকরণ হলো শিশুকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য করে তৈরি করার প্রক্রিয়া অর্থাৎ যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন, সমাজের রীতিনীতি অনুযায়ী চিন্তা ও কাজ করতে শেখে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শিশু বয়স থেকে আরম্ভ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রতিটি মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কখনও সমাজকে প্রভাবিত করে, আবার কখনও সে সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যার ফলে তার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা নিজের মত করে সমাজের একটি সংজ্ঞা লিখি।

কাজ-২

প্রিয় শিক্ষার্থী, চলুন আমরা সমাজের উপাদানগুলোর একটি চার্ট তৈরি করি। (পোস্টার পেপার ব্যবহার করুন।)

কাজ-৩

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা এবার “সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপই হল সমাজ”-এ উক্তিটি ব্যাখ্যা করি।

পর্ব-খ: সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও শিশুর সামাজিকীকরণে সংস্কৃতির ভূমিকা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পর্ব-‘ক’তে আমরা সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করব। মূলতঃ সংস্কৃতি হচ্ছে A way of life বা জীবনযাপন পদ্ধতি। সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আইনপ্রথা এবং অন্যান্য সামর্থ্য ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টি হলো তার সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি জটিল সামগ্রিক ব্যবস্থা যার অন্তর্গত রয়েছে সমস্ত মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, আস্থা-বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, মূল্যবোধ, প্রভৃতি সবকিছু যা মানুষ সমাজের একজন সদস্য হিসেবে অর্জন করে থাকে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও দ্বিমুখী। সংস্কৃতি একদিকে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কৃতির লালন ও উন্নয়ন সাধন করে। এক কথায় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো শিক্ষা। আবার কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতির প্রভাব অনিবার্য। শিশু জন্মের পর থেকে সমাজের কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণেই সে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। এ

কারণেই শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণে তথা সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ঐ সমাজের জীবন পদ্ধতি, ভাষা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা, লোকাচার, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা, ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

প্রথা

প্রত্যেক সমাজের রয়েছে নিজস্ব রীতি-নীতি আচার-আচরণ, চাল-চলন, উৎসব ইত্যাদি। আর এগুলিই প্রথা। প্রথাগুলি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মুল্যবোধ থেকে সৃষ্ট। আমাদের সমাজে বড়দের সালাম দেয়া, আদাব দেয়া; ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদি প্রথা। তেমনি বর্ষবরণ, নবান্ন উৎসব -এগুলি ধর্মীয় উৎসব নয় তবে দেশীয় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা।

নববর্ষ
দিন কাটুক প্রাণের গানে...
রেস্টুরেন্ট-এর

১লা বৈশাখ উদযাপনের একটি দৃশ্য

কাজ-১

নিচের বৃত্তের বিষয়গুলো যেটি যে কলামে প্রযোজ্য সে কলামে লিখুন।

বাল্য বিবাহ রোধ, বড়দের সম্মান করা, শিশুদের কপালে কাল টিপ দেওয়া, শীতকালে পিঠে খাওয়া, ঈদে নতুন জামা কাপড় পরা, বৈশাখী মেলা, ক্রিকেট খেলা দেখা, বাঙালিদের ভাত খাওয়া, পরোপকার করা, মসজিদে নামাজ পড়া, নামাজের সময় টুপি পরা, সকাল ও সন্ধ্যায় বাকীতে বিক্রি না করা, বৃক্ষরোপণ করা, কুরবানী করা, ঈদে বেড়াতে যাওয়া, পরিবার পরিকল্পনা, সত্য কথা বলা, গায়ে হলুদ, টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দেখা, বাঙালি মেয়ের শাড়ী পরা, দুর্গাপূজা করা, ন্যায় পথে চলা, বড়দিন, অতিথি আপ্যায়ন করা, বিয়ের দিনে বৃষ্টি হওয়া শুভ, সন্তান লালন পালনে মেয়েদের দায়িত্ব, বাঙালি পুরুষের লুঙ্গি পরা, ঘুষ না নেয়া, রেডিও শোনা, বিয়ে বাড়ী সাজান, দেখা হলে সালাম বিনিময় করা, পৌষ মেলা

অভ্যাস	দৃষ্টিভঙ্গি	বিশ্বাস	মূল্যবোধ	অবসর যাপন	উৎসব পালন

পর্ব- গঃ পরিবারের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার ও সহপাঠীর ভূমিকা

পরিবার

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বাড়ীতে আপনাদের কে কে আছেন তা খাতায় লিখুন।

এই যে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, ছেলে মেয়ে ইত্যাদি সদস্য নিয়ে যে সংগঠন গড়ে উঠেছে এটাকে আমরা কি বলে আখ্যায়িত করতে পারি? হ্যাঁ বন্ধুরা পরিবার।

পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম মানব গোষ্ঠী। গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপই হলো পারিবারিক জীবন। প্রত্যেকটি মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এমন কোন মানব সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে পরিবার প্রথা নেই। পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, “পরিবার হল একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়”।

আদর্শ পরিবারের দৃশ্য

পরিবারের প্রকারভেদ

বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

১. স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) এক পত্নীক পরিবার (খ) বহুপত্নীক পরিবার (গ) বহুপতি পরিবার।

২. পরিবারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কার ওপর ন্যস্ত তার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

(ক) পিতৃপ্রধান পরিবার (খ) মাতৃপ্রধান পরিবার।

৩. বিবাহ উত্তর বাসস্থানের ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ (ক) পিতৃবাস পরিবার (খ) মাতৃবাস পরিবার (গ) নয়াবাস পরিবার।

৪. বংশ গণনার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়, যথাঃ

(ক) পিতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার (খ) মাতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার।

৫. পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয় যথাঃ

(ক) অণু পরিবার (খ) বর্ধিত পরিবার (গ) যৌথ পরিবার।

সামাজিকীকরণের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে পরিবারের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মূলত শিশুর চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তর রচিত হয় পরিবারেই। কীভাবে কথা বলতে হয়, নিজের আবেগ কীভাবে প্রকাশ করা হয় তা শিশু পরিবার হতেই শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ সে যাতে ভবিষ্যৎ জীবনের জীবনযুদ্ধে মুখোমুখি হতে পারে তার জন্য পূর্ব হতেই পরিবার তাকে শিক্ষা প্রদান করে। পরিবার শিশুর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। শিশুর চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাষা শিক্ষা দেওয়া, আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান করার দায়িত্বও পরিবারের।

তাই পরিবারকে মানব জীবনের শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়।

সহপাঠী ও খেলার সাথী

একই শ্রেণীতে একই সাথে যারা পড়াশুনা করে তারাই সহপাঠী। শিশুর সামাজিকীকরণে তার সহপাঠী বা খেলার সাথীরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। শিশু তার খেলার সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী পরিস্ফুটিত হয়। সে স্বাবলম্বী হতে শিখে। অন্যদিকে কিশোর অপরাধী হওয়ার অন্যতম কারণ হল খেলার সাথী। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব শিশু রেললাইন, রাস্তা,

অলিগলি, বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় ও খেলাধূলা করে তারা পরবর্তীকালে বিভিন্নরকম অপরাধমূলক কাজে বেশি লিপ্ত হয়। অর্থাৎ একটা শিশুকে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত করার ব্যাপারে খেলার সাথী বা সঙ্গীসাথী খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সহপাঠীদের দলীয় কাজের একটি দৃশ্য

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, পরিবারের প্রকারভেদ এর একটি চার্ট তৈরি করুন। (পোস্টার পেপার ব্যবহার করুন)

কাজ-২

“পরিবার মানব জীবনের শাশ্বত বিদ্যালয়” উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা, পরিবার ও সহপাঠী

সমাজ

সাধারণত সমাজ বলতে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝি। শুরুতে সমাজ বলতে মানুষের সব রকম পারস্পরিক সম্পর্ককেই বুঝাত।

ম্যাকাইভার বলেন, “সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপই হল সমাজ।” ম্যাকাইভার সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝিয়েছেন-যার মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস বলেন, মানুষকে নিয়েই সমাজ, মানুষ পরস্পরের সাথে যৌথভারে মিলেমিশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একত্রিত হয় বা কোন সংগঠন গড়ে তোলে তবে তাকে সমাজ বলে।

এরিস্টটল বলেছেন, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবিহীন মানুষ হয় দেবতা, না হয় পশু।

সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজে বাস করে আসছে। সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান। সাধারণত দু’টি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে কোন জনসমষ্টিকে সমাজ বলা যায়।যথা:

১) বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস।

২) এই সংঘবদ্ধতার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য থাকা।

সামাজিক অস্ড়িত্বের এ দুটি শর্ত পূরণ করতে হলে সংঘবদ্ধ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও অভিন্ন অনুভূতি থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যখন বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই তাকে সমাজ বলা হয়।

সমাজের উপাদান

১। **সংঘবদ্ধ মানুষ:** সমাজের প্রধান উপাদান হল সংঘবদ্ধ মানুষ। মানুষ ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

২। **পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা:** পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা না থাকলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর সামাজিক সম্পর্কহীন মনুষ্য গোষ্ঠীকে সমাজ বলা যায় না। সুতরাং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা সমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে অভিহিত করা যায়।

৩। **সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য:** সমাজ গঠন করতে যেমন কিছুসংখ্যক মানুষের প্রয়োজন তেমনি ঐ সব মানুষের মধ্যে কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে এবং এসব সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অল্প-বিস্তর চেতনাও থাকে। কেবলমাত্র সমাজের মধ্যে সাদৃশ্যই থাকবে- এটা ঠিক নয়। যেসব মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত, সেসব মানুষের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

৪। **সহযোগিতা:** সহযোগিতা হল সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ সহযোগিতা ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতা হল সমাজের ভিত্তি।

৫। **পরস্পর নির্ভরশীলতা:** পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজের আরেকটি উপাদান। সমাজের মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ একা বাঁচতে পারে না। সমাজে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না।

সামাজিকীকরণ

সামাজিকীকরণ হলো শিশুকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য করে তৈরি করার প্রক্রিয়া অর্থাৎ যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন, সমাজের রীতিনীতি অনুযায়ী চিন্তা ও কাজ করতে শেখে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শিশু বয়স থেকে আরম্ভ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রতিটি মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কখনও সমাজকে প্রভাবিত করে, আবার কখনও সে সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যার ফলে তার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

সংস্কৃতি

বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দটির ইংরেজি হলো কালচার (Culture)। ষোল শতকের শেষার্ধে ফ্রান্সিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে Culture শব্দটা ব্যবহার করেন। সংস্কৃতি শব্দটি প্রায় প্রতিদিনই আমরা ব্যবহার করে থাকি। মূলত সংস্কৃতি হচ্ছে A way of life যাকে বাংলায় বলে জীবন যাপন পদ্ধতি। অতএব কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতিকে বা প্রণালীকে বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে, সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি। মানুষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত। সে কারণে এর চিরন্তন কোন রূপ নেই অর্থাৎ পরিবর্তনশীল।

টি.এস.ইলিয়ট (T.S.Eliot) এর মতে "মানুষের বৈশিষ্ট্যময় কার্যকলাপ এবং আগ্রহই হলো তার সংস্কৃতি"।

ই.বি টায়লর (E.B.Taylor) এর মতে, "সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আইনপ্রথা এবং অন্যান্য সামর্থ্য ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টিই হলো তার সংস্কৃতি"। অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি জটিল সামগ্রিক ব্যবস্থা যার অন্তর্গত রয়েছে সমস্ত মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, আস্থা-বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, মূল্যবোধ, প্রভৃতি যাকিছু মানুষ সমাজের একজন সদস্য হিসেবে অর্জন করে থাকে। টাইলরের সংজ্ঞাটি আরো সহজ করে বললে সমাজস্থ মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীকে সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা যায়। এখানে মার্জিত-অমার্জিতের কোন স্থান নেই।

কিংসলে ডেভিস বলেছেন, ''Man's social life is governed by his culture''। অতএব সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবনের প্রকাশ ঘটায় যেসব উপাদান তাই তার সংস্কৃতি।

নথ এর মতে, "কোন সমাজের সদস্যরা বংশ পরস্পরায় যেসব আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান উওরাধিকার সূত্রে লাভ করে তাই সংস্কৃতি।"

সংস্কৃতি একাধারে জীবন যাত্রার নিয়ম প্রণালী, যথাঃ আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব, অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, ভাষা, অনুভূতি, বিবাহ পদ্ধতি, মৃত্যুর পর সৎকার পদ্ধতি, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়গুলি। অন্যদিকে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও উপকরণের সামগ্রিক রূপ যেমনঃ ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন প্রভৃতি সংস্কৃতির অঙ্গ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়ক সকল কিছুই হলো সংস্কৃতি।

মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সংস্কৃতির ভূমিকা অনন্য। সংস্কৃতি মানুষের চাহিদা মেটাতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।

১. সংস্কৃতি ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।
২. সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যক্তিকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে শেখায়।
৩. সংস্কৃতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে।

প্রথা

প্রত্যেক সমাজের রয়েছে নিজস্ব রীতি নীতি, আচার-আচরণ, চাল-চলন, উৎসব। আর এগুলিই প্রথা। প্রথাগুলি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে সৃষ্ট। আমাদের সমাজে বড়দের সালাম দেয়া, আদাব দেয়া; ছোটদের স্নেহ করা প্রথা। তেমনি বর্ষবরণ, নবান্ন উৎসব -এগুলি ধর্মীয় উৎসব নয় তবে দেশীয় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও দ্বিমুখী। সংস্কৃতি একদিকে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কৃতির লালন ও উন্নয়ন সাধন করে। এক কথায় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো শিক্ষা। আবার কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতির প্রভাব অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন সমাজে যদি ধর্মের প্রভাব প্রবল থাকে তবে সে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। আবার কোন দেশের সংস্কৃতিতে যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব থাকে, তবে শিক্ষায়ও এর প্রভাব পড়বে।

মাটকথা, কোন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায় তার সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। বারলেট এর মতে, ''Social tradition influence ways of thinking, imagining, and doing creative things'' আর এই যে চিন্তা, মনে রাখা, কল্পনা করা, সৃজনশীলতা সব কিছুই শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত।

শিশু জন্মের পর থেকে সমাজের কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণেই সে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। এ কারণেই শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণে তথা সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগে যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হবে নিজস্ব সংস্কৃতির স্থায়িত্ব, অখনন্ডতা ও সংহতির জন্য কাজ করা। এজন্য শিক্ষার কাজ হবে অতীতের ভিত্তিতে বর্তমান সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের চাহিদার সাথে সমন্বয় সাধন। এদিক থেকে বলা যায়, কোন সমাজের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ঐ সমাজের জীবন পদ্ধতি, দেশীয় প্রতিষ্ঠান, ভাষা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা, লোকাচার, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা, ইত্যাদির সংরক্ষণ এবং যুগের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এগুলোর উন্নয়ন।

পরিবার

পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম মানব গোষ্ঠী। গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপই হলো পারিবারিক জীবন। প্রত্যেকটি মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এমন কোন মানব সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে পরিবার প্রথা নেই। পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করে।

অধ্যাপক নিমকফ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, “পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানাদি ছাড়া স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে”।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, "পরিবার হল একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়"।

পরিবারের গঠন প্রক্রিয়া

বিবাহ হল পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। এক জন পুরুষ সমাজ স্বীকৃত উপায়ে এক জন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে একটি একক পরিবার গঠন করে। তবে আদিম সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকেই পরিবার গঠিত হত। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা সম্ভব নয়। এমন পরিবার অজানা নয় যেখানে পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোন অথবা মা ও মেয়ে বা ছেলে অথবা বাবা তার অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ে অথবা দাদা তার নাতি বা নাতনি নিয়ে পরিবার গঠন করছে। সুতরাং বলা যায় যে, বিবাহের মাধ্যমে অথবা বিবাহ না করেও পরিবার গঠন করা যায়।

পরিবারের প্রকারভেদ

পরিবার বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান হলেও সমাজ ভেদে বা দেশ ভেদে পরিবারের রূপ ভিন্নরকম হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

১. স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) একপত্নীক পরিবার
(খ) বহুপত্নীক পরিবার
(গ) বহুপতি পরিবার।

২.পরিবারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

(ক) পিতৃপ্রধান পরিবার
(খ) মাতৃপ্রধান পরিবার।

৩. বিবাহ উত্তর বাসস্থানের ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

(ক) পিতৃবাস পরিবার
(খ) মাতৃবাস পরিবার
(গ) নয়াবাস পরিবার।

৪. বংশ গণনার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
(ক) পিতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার
(খ) মাতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার।

৫. পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
(ক) অণুপরিবার
(খ) বর্ধিত পরিবার
(গ) যৌথ পরিবার।

সামাজিকীকরণের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে পরিবারের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে যে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বংশগতি মূল উপাদান জোগায়। সংস্কৃতি নকশা তৈরি করে এবং পরিবারে পিতামাতা কারিগর হিসেবে কাজ করে। কারণ শিশুর সমস্ত দৈহিক, মানসিক, বস্তুগত ও অবস্তুগত যাবতীয় প্রয়োজন মেটায় পরিবার। পরিবারেই শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। মূলতঃ শিশুর চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তর রচিত হয় পরিবারেই। কীভাবে কথা বলতে হয়, নিজের আবেগ কীভাবে প্রকাশ করা হয় তা শিশু পরিবার হতেই শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের জীবনযুদ্ধে মুখোমুখি হতে পারে তার জন্য পূর্ব হতেই পরিবার তাকে শিক্ষা প্রদান করে। পরিবার শিশুর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। শিশুর চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাষা শিক্ষা দেওয়া, আচার আচরণ শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান করার দায়িত্ব একমাত্র পরিবারের। সমাজের একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাই পরিবারকে মানব জীবনের শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে ৩ টি সম্পর্কের ওপর। যথা :

(১) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক

(২) পিতা-মাতা ও শিশুর মধ্যে সম্পর্ক

(৩) পরিবারের শিশুদের মধ্যে সম্পর্কের ওপর।

সহপাঠী এবং খেলার সাথী

একই শ্রেণীতে একই সাথে যারা পড়াশুনা করে তারাই সহপাঠী। শিশুর সামাজিকীকরণে তার সহপাঠী বা খেলার সাথীরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। শিশু তার খেলার সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী পরিস্ফুটিত হয়। সে স্বাবলম্বী হতে শিখে। অন্যদিকে কিশোর অপরাধী হবার অন্যতম কারণ হল খেলার সাথী। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু রেললাইন, রাস্তা, অলিগলি, বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় ও খেলাধুলা করে তারা পরবর্তীকালে বিভিন্নরকম অপরাধমূলক কাজে বেশি লিপ্ত হয়। অর্থাৎ শিশুর অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হবার পেছনেও খেলার সাথী বা সঙ্গীসাথীদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

মূল্যায়নঃ

১। সমাজ কাকে বলে? সমাজের উপাদানগুলো আলোচনা করুন।

২। সামাজিকীরণ কি? সামাজিকীরণের গুরুত্ব ব্যাখা করুন।

৩। পরিবারের সংজ্ঞা দিন। পরিবারের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৪। সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? শিক্ষায় সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও গ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ

কাজ-১

অভ্যাস	দৃষ্টিভঙ্গি	বিশ্বাস	মূল্যবোধ	উৎসব পালন	বিনোদন
শিশুদের কপালে কাল টিপ দেওয়া ঈদে নতুন জামা কাপড় পরা বাঙালিদের ভাত খাওয়া ঈদে বেড়াতে যাওয়া বাঙালি মেয়ের শাড়ী পরা বাঙালি পুরুষের লুঙ্গি পরা	বাল্য বিবাহ রোধ বৃক্ষরোপণ করা পরিবার পরিকল্পনা সন্তান লালন পালনে মেয়েদের দায়িত্ব	মসজিদে নামাজ পড়া নামাজের সময় টুপি পরা সকাল ও সন্ধ্যায় বাকীতে বিক্রি না করা কুরবানী করা দুর্গাপূজা করা বিয়ের দিনে বৃষ্টি হওয়া শুভ	বড়দের সম্মান করা, পরোপকার করা সত্য কথা বলা ন্যায় পথে চলা অতিথি আপ্যায়ন করা ঘুষ না নেয়া দেখা হলে সালাম বিনিময় করা	শীতকালে পিঠে খাওয়া বৈশাখী মেলা গায়ে হলুদ বড়দিন বিয়ে বাড়ী সাজান পৌষ মেলা	ক্রিকেট খেলা দেখা টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দেখা রেডিও শোনা

ইউনিট-১ **অধিবেশন-২**

ধর্ম, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস

ভূমিকা

সমাজে সুশৃংখল জীবনযাপন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। ধর্ম ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমে তাকে মানসিক সুখ ও শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি সমাজ ব্যবস্থার একটি মৌলিক ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ধর্ম সত্য, সুন্দর, দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তাই ধর্ম জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

ধর্মের পাশাপাশি মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সমাজ জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। মূল্যবোধ একটি জাতির দর্শন এবং শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার নীতিমালা যা সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক।

আর বিশ্বাস মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জীবন পরিচালনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। বিশ্বাস জ্ঞান ও উপলব্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ধর্ম কী-তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিশুর বিকাশে ধর্মের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূল্যবোধের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন এবং শিশুর মূল্যবোধ বিকাশের ধরন উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিশ্বাসের ধারণা এবং এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক: ধর্ম ও শিশুর বিকাশে ধর্মের প্রভাব

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের মধ্যে কেউ নামাজ পড়ে, কেউ পূজা করে, কেউবা ধ্যানে মগ্ন হয়। এরকম বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

বন্ধুরা, আপনারা কি বলতে পারেন এগুলো কোন ধরনের কাজ? বন্ধুরা, এগুলো ধর্মীয় কাজ। এখন প্রশ্ন আসে, কেন আমরা এসব কাজ করে থাকি এবং ধর্মইবা কী?

শিক্ষার্থীবৃন্দ, ধর্ম হচ্ছে এক অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস, যে শক্তি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকল সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং যিনি সর্বশক্তির আধার, সেই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তাঁর প্রতি ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদ্গত হয়ে তাঁর দেওয়া প্রত্যাদিষ্ট বিধি-বিধান মতে সকল কার্জ পরিচালনা করা। ধর্ম ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমে তাকে মানসিক সুখ ও শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি সমাজ ব্যবস্থার একটি মৌলিক ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ধর্ম সত্য, সুন্দর, দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তাই ধর্ম জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি যে ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি ঐ ধর্মের রীতিনীতি ও বিধানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। শৈশব কাল হতে যে ব্যক্তি যে ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি ঐ ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা লালিত হয় এবং সে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তীকালে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ, সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম মানুষকে মন্দ পথ পরিহার করে সৎপথে চলার নির্দেশ দেয়; আচরণে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। এককথায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যক্রমের একটি দৃশ্য

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিজের মত করে লিখুন ধর্ম বলতে কী বোঝায়?

কাজ-২

শিশুর বিকাশে ধর্ম কী ধরনের প্রভাব রাখতে পারে সে সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করুন। পরে শিখনীয় বিষয়বস্তু পড়ে নিজের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করুন।

পর্ব-খঃ মূল্যবোধের ধারণা ও শিশুর বিকাশে এর প্রভাব

প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা বড়দের শ্রদ্ধা করি, ছোটদের স্নেহ করি, অন্যের বিপদে সাহায্য করি, সত্য কথা বলি, অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকি। বন্ধুরা, কেন আমরা এসব করি? কারণ এটাই আমাদের মূল্যবোধ। বন্ধুরা, আসুন আমরা প্রথমেই জেনে নেই মূল্যবোধ কী?

সাধারণ অর্থে একজন আদর্শ ব্যক্তির জীবনের গুণাবলীকে মূল্যবোধ বলা যায়। মূল্যবোধ একটি জাতির দর্শন এবং শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার নীতিমালা যা সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, "মূল্যবোধ হলো কতগুলো জৈব মানসিক (psycho-physical) সংগঠনের এমন এক সমন্বয় যা পরিবেশের বহু বিস্তৃত অংশকে সক্রিয়তার দিক থেকে সমগুণসম্পন্ন করে তোলে এবং ব্যক্তির মধ্যে উপযুক্ত আচরণ সৃষ্টি করে"। সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণধর্মী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ সৃষ্টিকারী জৈব-মানসিক প্রবণতাই হলো মূল্যবোধ।

প্রকৃতি অনুযায়ী মূল্যবোধকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
২। সামাজিক মূল্যবোধ
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধ
৪। প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ
৫। পেশাগত মূল্যবোধ
৬। বিনোদনমূলক ও সৌন্দর্যবোধমূলক মূল্যবোধ

কাজ-১

নিচের কোনটি কোন ধরনের মূল্যবোধ বাছাই করে টেবিল-১ এর সংশ্লিষ্ট কলামে লিখুন এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

ন্যায়পরায়ণতা, আত্ম-প্রতিষ্ঠা, সততা, নিয়মতান্ত্রিকতা, ভালবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সহমর্মিতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সচেতনতা, গোপনীয়তা রক্ষা করা, ফুল উপহার প্রদান, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ, গণতান্ত্রিক অধিকার।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ	**সামাজিক মূল্যবোধ**	**ধর্মীয় মূল্যবোধ**	**প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ**	**পেশাগত মূল্যবোধ**	**বিনোদনমূলক ও সৌন্দর্যবোধমূলক মূল্যবোধ**

কাজ-২

নিচের বৃত্ত থেকে মূল্যবোধের গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় আচরণ বাছাই করে টেবিল-২ এর সংশ্লিষ্ট কলামে লিখুন।

শ্রমের মর্যাদা দান, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, পরীক্ষায় নকল না করা, ঘুষ নেয়া, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা, লোভ না করা , কারো বাড়ী বা অফিসে প্রবেশের অনুমতি নেওয়া, ওয়াদা রক্ষা করা, পিতা-মাতাকে সম্মান করা, মানুষের সাথে অসৎ আচরণ করা, নিয়মিত নামাজ পড়া, রোজা না রাখা, অন্যের ক্ষতিসাধন করা, সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলা, ছিনতাই করা, মেহমানকে বাড়ীর গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া, শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা, পকেট মারা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, দান করা।

মূল্যবোধের গ্রহণীয় আচরণ	মূল্যবোধের বর্জনীয় আচরণ

মূল্যবোধের গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় আচরণ

পর্ব-গ: বিশ্বাসের ধারণা ও এর প্রভাব

প্রিয় শিক্ষার্থী, আল্লাহ এক এবং নিরাকার, পৃথিবী গোলাকার, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে- এসব কি আমরা নিজ চোখে দেখেছি? না বন্ধুরা, আমরা দেখিনি। তাহলে আমরা কি করে জানলাম। এগুলো আমাদের বিশ্বাস। বন্ধুরা, আসুন তাহলে আমরা জেনে নেই- বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?

বিশ্বাস বলতে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তির স্থায়ী ধারণা ও জ্ঞানকে বোঝায় অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক জগতের মূর্ত (Concrete) ও বিমূর্ত (Abstract) উভয় বিষয়ের বাস্তবধর্মী উপলব্ধিই (Realistic understanding) হচ্ছে বিশ্বাস।

জন্মগ্রহণ করার পর মাতৃকোল থেকেই শিশুর মনোজগতে বিশ্বাসের সৃষ্টি হতে থাকে। পরিবারের সদস্যদের আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, কথা-বার্তা, ধর্মানুশীলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ভিতরকার ধ্যান ধারণা প্রতিবর্তিত হয়ে (Reflexed) শিশুর বিশ্বাসগুলি সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সমাজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাবে তার বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাসের বিকাশ ঘটতে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়। ধর্মীয় জ্ঞান ও

দর্শন অনুযায়ী ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সৃষ্টি হয়। এভাবে বস্তু জগৎ, সুক্ষ্ম জগত ও পারলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বিশ্বাস মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জীবন পরিচালনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। বিশ্বাস জ্ঞান ও উপলব্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যেমন সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে তেমনই আবার সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। এ বিশ্বাসগুলোও সমাজে দৃঢ়বদ্ধ। সামাজিক রীতিনীতির ফলে সমাজে কিছু আস্থা বিশ্বাস, প্রথা এবং লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, প্রথা, লোকাচার আসলে সমাজ ও সংস্কৃতিরই ফসল।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থী, মূর্ত বিষয় থেকে বিশ্বাস এবং বিমূর্ত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের তিনটি করে উদাহরণ দিন। উদাহরণগুলো সঠিক হল কি না তা পরবর্তীতে মূল শিখনীয় বিষয় পড়ে জেনে নিন।

মূর্ত বিষয়	বিমূর্ত বিষয়

কাজ-২

সমাজে প্রচলিত পাঁচটি কুসংস্কারের নাম লিখুন।

১।

২।

৩।

৪।

৫।

মূল শিখনীয় বিষয়

ধর্ম, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস

ধর্ম

ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Religion'। এটি এসেছে ল্যাটিন 're' এবং 'legere' অথবা 'ligare' শব্দ থেকে যার অর্থ বন্ধন (bindback)। শব্দগত অর্থে ধর্ম হলো যা ব্যক্তিকে পারস্পরিক ভালবাসা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

বাংলায় 'ধর্ম' শব্দটির ধাতুগত অর্থ সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিজাত স্বভাব। যেমন- আমরা বলি পানির ধর্ম নিম্নগতি, বাষ্পের ধর্ম ঊর্ধ্বগতি, চুম্বকের ধর্ম সমমেরুতে বিকর্ষণ আর বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ ইত্যাদি। মানুষেরও অনুরূপ বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিজাত স্বভাব আছে। কিন্তু ধর্ম বলতে সরাসরি ঐ সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে বুঝায় না।

নৃবিজ্ঞানী টেইলর এর মতে, "ধর্ম হলো জীবের আত্মিক বিশ্বাস"।

ডুর্খেইম বলেন যে, "ধর্ম হলো পবিত্র জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানাদি"।

মনীষী ফেজার এ মতে, "ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন একটি শক্তিতে বিশ্বাস যা মানব জীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে"। তার মতে, ধর্মের মূল উপাদান ২টি। যথা: মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস এবং সে শক্তির আরাধনা।

অন্যান্য দার্শনিকদের মতে ঃ Religion consists in belif in a super human power or powers which control and guide the destiny of man, the sentiments of awe, reverence, love and devotion and the practical conduct which follows from them.

অর্থাৎ এক বা একাধিক শক্তি যা মানুষের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদ্গত বাস্তব আচার ব্যবহারকে ধর্ম বলে। --(Introduction to Philosopy – Jadu Nath Singh)

দার্শনিকদের উপরোক্ত সংজ্ঞা মতে, স্রষ্টার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধর্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মূলত: অধিকাংশ বিশ্বাস মতে ধর্মের উৎস স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত বাণী বা প্রত্যাদিষ্ট বাণী থেকে। স্রষ্টা মানুষের জন্য তাঁর স্বর্গীয় দূতের মাধ্যমে যুগে যুগে তাঁর মনোনীত মহাপুরুষেদের নিকট এসব বাণী প্রেরণ করেছেন। যে বাণীতে রয়েছে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, সামাজিক রাজনৈতিক, আরাধনা তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর নিয়ন্ত্রণাধিকার। এতে রয়েছে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধান আর মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি লাভের উপায় ও সন্ধান। অতএব, ধর্ম হচ্ছে এক মানবাতীত মহাশক্তি, যে শক্তি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকল সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং যিনি সর্বশক্তির আঁধার, সেই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদ্‌গত হয়ে তাঁর দেওয়া প্রত্যাদিষ্ট বিধি-বিধান মতে সর্ব কার্য পরিচালনা করা।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ধর্ম ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমে তাকে মানসিক সুখ ও শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি সমাজ ব্যবস্থার একটি মৌলিক ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ধর্ম সত্য, সুন্দর, দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তাই ধর্ম জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রত্যেক দেশে শিক্ষা শুরু হয়েছিল ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে। শুরুতে ধর্মই ছিল শিক্ষার ভিত্তি। যেমন: ভারতবর্ষে প্রাচীন ও মধ্য যুগে শিক্ষাব্যবস্থা মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধমঠ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি যে ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি ঐ ধর্মের রীতিনীতি ও বিধানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। শৈশব কাল হতে যে ব্যক্তি যে ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি ঐ ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা লালিত হয় এবং সে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তীকালে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ, সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম মানুষকে মন্দ পথ পরিহার করে সৎপথে চলার নির্দেশ দেয়, আচরণে

সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। এক কথায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। শিক্ষা ও ধর্ম উভয়ের উদ্দেশ্যই এক, অর্থাৎ ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে জাগ্রত করা। ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার কতগুলো দায়িত্ব পালন করে যার মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন হয়ে থাকে। ধর্ম নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক কাজ করে থাকে:

১. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার করে এবং সমাজের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে। নিজের সংস্কৃতিকে জানা শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম সংস্কৃতির একটি উপাদান।

২. ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আলোচনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে মহাপুরুষদের জীবনী সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে এবং তাঁদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন, তাই ধর্মের শিক্ষাগত মূল্য আছে।

৪. ধর্ম মানুষের নৈতিক মান উন্নত করায় প্রভাব বিস্তার করে। আমরা জানি, শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যক্তির নৈতিক জীবনের বিকাশ সাধন করা। ধর্মশিক্ষা এ লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

৫. ধর্ম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানুষকে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ করে দিয়ে তাদের সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।

৬. ধর্ম বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে সৌন্দর্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

দেখা যাচ্ছে ধর্ম শিক্ষার সকল রকম জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। তবে ধর্মের এই শিক্ষামূলক কাজ অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ এবং অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় না।

মূল্যবোধ

সাধারণ অর্থে একজন আদর্শ ব্যক্তির জীবনের গুণাবলীকে মূল্যবোধ বলা যায়। মূল্যবোধ একটি জাতির দর্শন এবং শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার নীতিমালা যা সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, “মূল্যবোধ হলো কতগুলো জৈব মানসিক (psycho-physical) সংগঠনের এমন এক সমন্বয় যা পরিবেশের বহু বিস্তৃত অংশকে সক্রিয়তার দিক থেকে সমগুণসম্পন্ন করে তোলে এবং ব্যক্তির মধ্যে উপযুক্ত আচরণ সৃষ্টি করে”। সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণধর্মী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণসৃষ্টিকারী জৈব-মানসিক প্রবণতাই হলো মূল্যবোধ। নিচে মূল্যবোধের কয়েকটি উদাহরণ উলে- খ করা হলো:

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান করা; প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করা; নিজের পড়ার ঘর ও টেবিল গুছিয়ে রাখা; পরীক্ষায় নকল না করা; স্বাস্থ্য ভাল রাখার অভ্যাস মেনে চলা; সত্যকে জানা ও বাস্তব জীবনে অনুশীলন করা; লোভ না করা ইত্যাদি। ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ ধরনের সাধারণধর্মী আচরণগুলো করতে পারে তখনই বলা যায় ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে।

মূল্যবোধের শ্রেণী বিভাগ

প্রকৃতি অনুযায়ী মূল্যবোধকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন:

১। ব্যক্তিগত মূল্যবোধঃ যা ব্যক্তির আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, রুচি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এটা ব্যক্তির আচার-আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠা, সততা, নিয়মতান্ত্রিকতা ইত্যাদি।

২। সামাজিক মূল্যবোধঃ সমাজ জীবনে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ অত্যাবশ্যক। ভালবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুষ্ঠু সামাজিক জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য এবং এসবই হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ।

৩। ধর্মীয় মূল্যবোধঃ সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা, সততা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে উদ্ভুত। অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রতি সহনশীলতা ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিচায়ক।

৪। প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধঃ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য সমাজের চাহিদা, প্রয়োজন, সমস্যা প্রভৃতির ভিত্তিতে গঠিত হয় যা প্রতিষ্ঠানের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। যেমন- সহযোগিতা, সচেতনতা।

৫। পেশাগত মূল্যবোধঃ পেশার আদর্শ, নৈতিক মানদন্ড, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি যা প্রতিষ্ঠানের কর্মীর আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে ও পেশার চালিকা ও শক্তিরূপে কাজ করে। যেমনঃ গোপনীয়তা রক্ষা করা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ, গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি।

৬। বিনোদনমূলক ও সৌন্দর্যবোধমূলক মূল্যবোধঃ মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও বিনোদন মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোন নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাধানের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তত সাত ধরনের মূল্যবোধ বিকশিত হওয়া উচিত। এগুলো হলোঃ

১। অর্থনৈতিক মূল্যবোধঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং বৃত্তিমূলক ও আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২। শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধঃ শিক্ষাক্রমে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিদ্যালয় কর্মসূচিতে শারীরিক ও বিনোদনমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায়।

৩। সামাজিক মূল্যবোধঃ বন্ধুত্ব, ভালবাসা, স্নেহ ইত্যাদি এক একটি সামাজিক মূল্যবোধ। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এসবের বিকাশে সহায়তা করা। শিক্ষার্থীদের নিজ চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করে, সামাজিক চাহিদা ও রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের নিজ চাহিদা ও সামাজিক চাহিদার

সমন্বয় করার দক্ষতা ও মনোভাব অর্জনের শিক্ষা দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব।

৪। **নৈতিক মূল্যবোধঃ** ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচারের জন্য যে মূল্যবোধ তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিক মূল্যবোধ কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণকে সঠিক পথে চালিত করতে সাহায্য করে।

৫। **সৌন্দর্য সম্ভোগের মূল্যবোধঃ** বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে এবং এসব সৃজনমূলক কাজে উৎসাহ ও অনুশীলনের সুযোগ করে দিয়ে এধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায়।

৬। **বৌদ্ধিক মূল্যবোধঃ** বৌদ্ধিক বিকাশ শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়াকে বৌদ্ধিক বিকাশ বলা হয়। উপযুক্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও শিখন-শেখানো কৌশল অবলম্বন, শিক্ষার্থীদের উচ্চতর পর্যায়ে চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ, জ্ঞান আহরণের স্পৃহা সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে বৌদ্ধিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায়। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই ছাড়াও অন্যান্য বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দান করতে হবে।

৭। **ধর্মীয় মূল্যবোধঃ** মানুষের আচরণ অনেকাংশে তার ধর্ম ও বিশ্বাস দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে এই মূল্যবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন, মৌলিক নীতি বা বিশ্বাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিকাশ সাধন করা সম্ভব।

বিশ্বাস

বিশ্বাস বলতে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তির স্থায়ী ধারণা ও জ্ঞানকে বোঝায় অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক জগতের মূর্ত (Concrete) ও বিমূর্ত (Abstract) উভয় বিষয়ের বাস্তবধর্মী উপলব্ধিই (Realistic understanding) হচ্ছে বিশ্বাস। যেমন : দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন মিলে পানি উৎপন্ন হয়। এটা একটি মূর্ত বস্তু পানি সম্বন্ধে প্রমাণিত সত্য জ্ঞান থেকে আমাদের বিশ্বাস। তেমনি: ‘প্রত্যেক মানুষের মন, আত্মা, চিন্তা শক্তি, বুদ্ধি আছে’। অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে এসব বিমূর্ত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস জন্মে।

অনুরূপ স্রষ্টা, আল্লাহ, স্বর্গ, নরক, স্বর্গীয় দূত, অবতার, পরজগৎ, প্রেরিত ও পরজগতের সুখ-শান্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্বাস বিমূর্ত বিষয়ক বিশ্বাস। এসব বিশ্বাস ধর্মীয় জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে উদ্ভুত। অতএব অন্য কথায় বলা যায়, বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তির উপলব্ধি ও জ্ঞানের সমন্বিত রূপই হচ্ছে বিশ্বাস।

জন্মগ্রহণ করার পর মাতৃকোল থেকেই শিশুর মনোজগতে বিশ্বাসের সৃষ্টি হতে থাকে। পরিবারের সদস্যদের আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, কথা-বার্তা, ধর্মানুশীলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ভিতরকার ধ্যান ধারণা প্রতিবর্তিত হয়ে (Reflexed) শিশুর বিশ্বাসগুলি সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সমাজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাবে তার বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাসের বিকাশ ঘটতে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়। ধর্মীয় জ্ঞান ও দর্শন অনুযায়ী ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সৃষ্টি হয়। এভাবে বস্তু জগৎ, সুক্ষ্ম জগত ও পারলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বিশ্বাস মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জীবন পরিচালনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। বিশ্বাস জ্ঞান ও উপলব্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, বর্তমানে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে ‘পৃথিবী গোলাকৃতি’। বিগত এক সময় এ বিশ্বাস ছিল না। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধর্মের লোকের মধ্যে তার স্বীয় ধর্মের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অভাব দেখা যায়। ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে এটা হয়। অনুরূপভাবে পারিবারিক প্রভাবে সৃষ্ট কতগুলো বিশ্বাস শিশুর মধ্যে এতই দৃঢ়বদ্ধ যে শিক্ষার প্রভাবেও এগুলো সহজে পরিবর্তন করা যায় না। লেখা পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে এবং যার ফলে তাদের মধ্যে সত্য, সুন্দর ও সঠিক বিশ্বাস সৃষ্টি হয় সে দিকে শিক্ষকদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যেমন সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে; তেমনই আবার সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। এ বিশ্বাসগুলোও

সমাজে দৃঢ়বদ্ধ। সামাজিক রীতিনীতির ফলে সমাজে কিছু আস্থা বিশ্বাস, প্রথা এবং লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, প্রথা, লোকাচার আসলে সমাজ ও সংস্কৃতিরই ফসল।

মানব সমাজের আদিম স্তর থেকে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত মানুষ তার প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারকে এখনো অনেক ক্ষেত্রে ধরে আছে এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত সমাজেও বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও লোক সংস্কারের প্রভাব আজও বিদ্যমান। বহু ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাসগুলোকে চেষ্টা করেও সমাজ থেকে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষিত মহিলারা এখনো আমাদের সমাজে তাদের শিশু সন্তানদের কপালে এমনভাবে কাজলের টিপ দেন যাতে কারো কুনজর পড়ে ক্ষতি না হয়। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এলাকায় রবিবারে কেউ বাঁশ কাটে না। মনে করা হয় যে, এই দিনে বাঁশ কাটা উচিৎ নয়। কারণ মানুষের বিশ্বাস রবিবার বাঁশের জন্মদিন। অন্যদিকে অনেকে বিশ্বাস করেন কাউকে যদি ইলিশ মাছ নিয়ে যেতে দেখা গেল তার যাত্রা শুভ হবে। কোন কিছু হবে না, একথা ভাববার সময় যদি টিকটিকি টিকটিক করে তবে সেটি করা উচিত নয় বলে মনে করা হয়। সম্ভবত, টিকটিকি টিকটিক করে বলেই আমরা বিশ্বাস করি যা ভাবছি তা ঠিক হবে। এরকম বহু ধরনের বিশ্বাসের বেড়াজালে আমাদের সমাজ জীবন আবদ্ধ। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এধরনের বিশ্বাসকে অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কার বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

মূল্যায়নঃ

১. ধর্ম বলতে কী বোঝায়- ব্যাখ্যা করুন।

২. শিশুর বিকাশে ধর্মের প্রভাব বর্ণনা করুন ।

৩. মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিন এবং শিশুর মূল্যবোধ বিকাশের ধরনগুলো বিশ্লেষণ করুন।

৪. বিশ্বাসের ধারণা এবং এর প্রভাব বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর:

পর্ব-ক ও খ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-গ

কাজ-১

মূর্ত বিষয়	বিমূর্ত বিষয়
১। অক্সিজেন দহনে সহায়তা করে। ২। চুম্বক সমমেরুতে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ করে। ৩। দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন মিলে পানি উৎপন্ন হয়।	১। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় ২। ইহকাল শেষে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। ৩। কৃতকর্ম অনুযায়ী বেহেস্ত-দোযখ নির্ধারিত হবে।

কাজ-২

সমাজে প্রচলিত পাঁচটি কুসংস্কার :

১। কোন কাজে শুরুতে বাধা পড়লে তা অশুভ লক্ষণ। সে কাজে সফল হওয়া যায় না।

২। রাত্রিতে একাকী ইলিশ মাছ নিয়ে যাত্রা করলে ভূতে ধরে।

৩। শিশু সন্তানদের কপালে কাজলের টিপ দিলে কারো কুনজরে ক্ষতি হয় না।

৪। রবিবার বাঁশের জন্মদিন। তাই এই দিনে বাঁশ কাটা ঠিক নয়।

৫। ভয় পাওয়ার পর বুকে থুথু দিলে ভয় দূর হয়।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৩**

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, ফলাফল ও প্রতিরোধ

ভূমিকা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। এ সমস্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে যা সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি অন্যতম সমস্যা যা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শারীরিক কারণে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আর এর প্রভাব কৃষি, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবেশসহ রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান জনসমষ্টিকে শিক্ষিত, সচেতন ও দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে এবং জনসংখ্যা বিষয়ক কঠোর সামাজিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বর্তমান অধিবেশনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ শনাক্ত করতে পারবেন এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের জীবনযাত্রার উপর কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমেই নিচের ডান পাশের বক্সটি কাগজ দিয়ে ঢেকে দিন। এরপর চেয়ারে বসে একাগ্রচিত্তে বাংলাদেশে বিরাজমান সমস্যা নিয়ে পাঁচ মিনিট চিন্তা করুন এবং সমস্যাগুলো খাতায় লিখুন। লেখা শেষ হলে কাগজটি সরিয়ে বক্সের লেখার সাথে মিলিয়ে দেখুন।

দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, সম্পদের অসম বণ্টন, অনিয়ম ও দূর্নীতি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্ম সংস্থানের অভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি

হ্যাঁ বন্ধুরা, এরকম অনেক সমস্যা আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্থ করছে। এসব সমস্যার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি অন্যতম সমস্যা যা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়।

অপরিকল্পিতভাবে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীরব হুমকি ও ভয়াবহতায় বিশ্বের সচেতন বিবেকবান মানুষ আজ ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ কোটির মধ্যে ছিল। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০০ কোটি, এরপর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ২০০ কোটি এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৪০০ কোটিতে দাঁড়ায়। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে দেখা যায় ২০২৮ খ্রিস্টাব্দে এই জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৮০০ কোটিতে দাঁড়াবে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটিতে পৌঁছেছে, যা ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যার প্রায় বার গুণ। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ বৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এই জনস্ফীতিকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নামে অভিহিত করা যায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উর্ধ্বগতিও হতাশাজনক। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির হিসেব হতে দেখা যায় যে, এ দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭.৬৪ কোটি। ২০০১ সালে এই জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১২.৯৩ কোটি। অর্থাৎ ২৭ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫.২৮ কোটি। ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কম। তবে এই হারে বাড়তে থাকলেও ২০১০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৫ কোটি হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে চারটি প্রধান কারণ। কারণ চারটি হল: সামাজিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ, ধর্মীয় কারণ এবং শারীরিক কারণ।

কাজ-১

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ডান পাশের কলামে লিখুন এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখুন।

১	পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ছিল?	
২	২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত হতে পারে?	
৩	বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার সংখ্যা কত?	
৪	১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত হয়েছিল?	
৫	উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ আকার ধারণ করে কখন থেকে?	

কাজ-২

যেসব সামাজিক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেগুলো শনাক্ত করুন এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখুন।

কাজ-৩

অর্থনৈতিক কারণে কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন এবং পরবর্তীতে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তু পড়ে আপনার ধারণা আরও সমৃদ্ধ করুন।

পর্ব-খ: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল

প্রিয় শিক্ষার্থী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া একটি দেশের যেকোন ক্ষেত্রের উপর হতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যেমন- অর্থনীতি, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান কৃষি, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবেশের উপর জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক উন্নতিকে বাঁধাগ্রস্থ করে যা অত্যন্ড় ক্ষতিকর। এ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরো কিছু গৌণ কারণ রয়েছে। যেমনঃ পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক দুর্যোগ ইত্যাদি। অবশ্য এগুলো প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে জড়িত নয়; তবে পরোক্ষভাবে প্রজনন্ন প্রবণতাকে প্রভাবিত করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। তাই পরিবেশ দূষিত হয়। পরিবেশের ভারসাম্য এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সৃষ্ট সমস্যার একটি দৃশ্য

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কী কী সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো সনাক্ত করুন?

কাজ-২

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গৌণ কারণগুলো কী কী?

পর্ব-গঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এজন্য দেশের জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তোলা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা, বাল্যবিবাহ রোধ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তন করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে প্রচারণামূলক কার্যক্রম চালু করা এবং পরিবার পরিকল্পনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কাজ-১

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার একটি চার্ট তৈরি করুন।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, ফলাফল ও প্রতিরোধ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

অপরিকল্পিতভাবে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীরব হুমকি ও ভয়াবহতায় বিশ্বের সচেতন বিবেকবান মানুষ আজ ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। বিশ্বের এই সমস্যা সামগ্রিক সমস্যার ঊর্ধ্বে। তাই জনসংখ্যা সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণজনিত এ মারাত্মক সংকট সমাধানের বহুমুখী প্রচেষ্টা। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের সকল প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করে জীবনমানের উন্নতিকল্পে সহায়তা প্রদান করার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জনসংখ্যা

সাধারণ অর্থে জনসংখ্যা বলতে কোন একটি দেশ, বিশেষ অঞ্চল কিংবা বিশ্বের যৌথ জনসমষ্টিকে বুঝায়। সমাজ বিজ্ঞানী ডুরখেইম জনসংখ্যা বলতে সামাজিক একক বা সমাজের ব্যক্তির সংখ্যাকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সংঘবদ্ধভাবে বসবাসরত বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের সমষ্টিই হচ্ছে জনসংখ্যা বা population। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় জনসংখ্যা হচ্ছে, রাষ্ট্র গঠনের একটি মৌলিক উপাদান। ইবনে খালদুন (১৩৪২-১৪০৬ খৃঃ) জনসংখ্যাকে একটি দেশের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে দেশের উৎপাদন ও আয় জনসংখ্যার সমষ্টিগত শ্রমের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ সম্পদকে যথাযথভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলতে না পারলে তা প্রয়োজনীয় জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয় না। দেশের বঞ্চিত জনসম্পদকে গ্রহণযোগ্য কাঙ্ক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য চাই কার্যকর জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও শিক্ষা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে পর্যালাচনা করলে দেখা যায় ৫০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ কোটির মধ্যে ছিল। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০০ কোটি, এরপর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ২০০ কোটি এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৪০০ কোটিতে দাঁড়ায়। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে, ২০২৮ খ্রিস্টাব্দে এই জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৮০০ কোটিতে দাঁড়াবে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটিতে পৌঁছেছে যা ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যার প্রায় বার গুণ। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ বৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এই জনস্ফীতিকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নামে অভিহিত করা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির হিসেব হতে দেখা যায় যে, এ দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭.৬৪ কোটি। ২০০১ সালে এই জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১২.৯৩ কোটি। অর্থাৎ ২৭ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫.২৮ কোটি। ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কম। তবে এই হারে বাড়তে থাকলেও ২০১০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৫ কোটি হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতিধারা

সাল	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)
১৮৬০	২ কোটি	—
১৯৪১	৪.২০ কোটি	—
১৯৫১	৪.১৯ কোটি	—
১৯৬১	৫.৫২ কোটি	—
১৯৭৪	৭.৬৪ কোটি	—
১৯৮১	৮.৯৯ কোটি	২.৩৬
১৯৯১	১১.১৪ কোটি	২.১১
২০০১	১২.৯৩ কোটি	১.৪৮
২০০৬	১৪.০০ কোটি (প্রায়)	১.৪৮

বাংলাদেশ ভূখন্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন লেখচিত্রের সাহায্যে ৩.২ নং চিত্রে দেখানো হল।

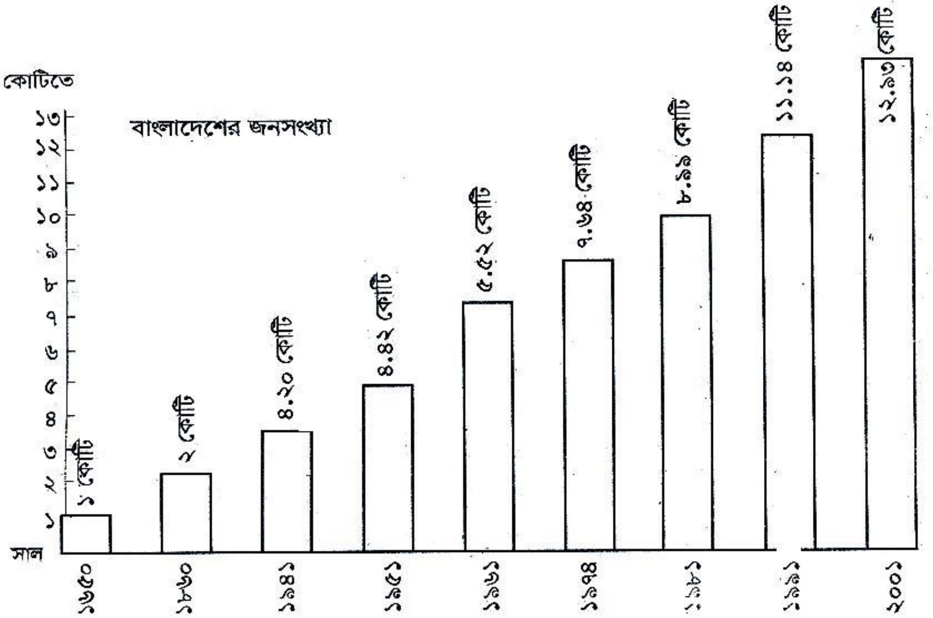

চিত্র ৩.২ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

লেখ চিত্র হতে দেখা যায় যে, আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৫.৫২ কোটি এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.১৫ কোটিতে। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা এই ৩০ বছরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অতীতে এত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। চিত্রে লক্ষ্য করা যায়, ১৮৬০ সালে বাংলাদেশ ভূখন্ডে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি। ১৯৪১ সালে তা হয়েছে ৪.২০ কোটি। অর্থাৎ ৮০ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। তারও আগে দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে প্রায় দু'শ বছর।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

জনসংখ্যা বর্তমান বিশ্বের একটি প্রধান আলোচিত বিষয়। বিশ্ব জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বজনসংখ্যা পরিস্থিতিকে উন্নত ও উন্নয়নশীল অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ এবং সাবেক রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান। অপরদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সকল দেশই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের সকল দেশেই জনসংখ্যা কম বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অত্যন্ত বেশি। ফলে উন্নত দেশগুলোর চেয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো জনসংখ্যা সমস্যার ভারে অধিক জর্জরিত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন একক কারণ নেই। নানাবিধ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কোন দেশের জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষভাবে যে কারণগুলো দায়ী তা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু ও দেশান্তরের পরিমাণ। এক বছর সময়ের মধ্যে যত শিশুর জন্ম হয় তা থেকে বিভিন্ন বয়সের মৃত্যু সংখ্যা বাদ দিলে যে জনসংখ্যা থাকে তাহলো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক বর্ধিত জনসংখ্যা। তাছাড়া বিদেশ থেকে আগত লোকসংখ্যা যোগ হয়ে এবং দেশত্যাগীদের সংখ্যা বিয়োগ হয়ে সর্বমোট যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাই হলো ১ বছর সময়ে পরিবর্তিত জনসংখ্যা। জনসংখ্যা কী কী বিশেষ কারণে বেড়ে চলেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণত চারটি কারণে হয়। কারণগুলো হল: (ক) সামাজিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) ধর্মীয় এবং (ঘ) শারীরিক কারণ।

(ক) সামাজিক কারণ

* বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ
* বড় পারিবারিক প্রবণতা
* ছেলে শিশু জন্ম দেবার আকাঙ্ক্ষা
* অধিক শিশুর মৃত্যুর হার
* অশিক্ষা ও অজ্ঞতা
* গ্রাম ও শহরের কারণে
* সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে

(খ) অর্থনৈতিক কারণ

* নিম্ন জীবনযাত্রার মান
* নির্ভরশীলতা
* কৃষি প্রধান অর্থনীতি
* পেশা
* মহিলাদের কর্মসংস্থান
* অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা

(গ) ধর্মীয় কারণ

ধর্মান্ধতা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণে অনীহা এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে পাপ কাজ বলে মনে করা হয়। ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করে ভাগ্য বিশ্বাসে অধিক সন্ড়ান জন্ম দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস এবং বিধি বিধানের ফলে জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জনসংখ্যা বেশি বলে ক্যাথলিক ও মুসলিম প্রধান দেশে জনসংখ্যা বেশি।

(ঘ) শারীরিক কারণ

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তাড়াতাড়ি মেয়েদের যৌবন প্রাপ্তি ঘটে। ফলে যে সব মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে হয় তারা সাধারণত বহু সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। দেখা গেছে যেসব মেয়েদের ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হয় সেইসব মেয়েরা ৪৯ বছর বয়স পর্যস্ড় সাধারণত ১২টি সন্তান জন্ম দিতে পারে। বয়স যত বাড়তে থাকে সন্তান ধারণ ক্ষমতা ও জন্মদান তত কমতে থাকে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অতিরিক্ত আমিষ গ্রহণের জন্য মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা কম থাকে। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে অতিরিক্ত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত জন্মহারের অন্যতম কারণ। তাছাড়া আছে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু পদ্ধতির অভাব ও প্রতিক্রিয়া। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব এবং সুষ্ঠু পদ্ধতি গ্রহণে দক্ষতার অভাবেও অনেক দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন।

জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে মানুষ স্বাভাবিক কারণেই খাদ্যশস্য ফলানোর কিংবা পশু চরাণোর সুবিধার জন্য বন জঙ্গল কেটে সাফ করে। আর এতে বাস্তু-সংস্থানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষরতার হারও বেড়ে যায়। নিরক্ষর মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন নয়।

জনসংখ্যা, পারিবারিক জীবন ও জীবনমান

জনসংখ্যার সাথে পারিবারিক জীবন ও জীবনযাত্রার মানের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি পারিবারিক জীবন ও জীবনযাত্রার মানকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। সীমিত জনসংখ্যা একটি পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করে। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সংসারের নানা অভাব অনটন ও সংকট দেখা দেয় এবং জীবন মান জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবারের সঞ্চিত মূলধনের

পরিমান হ্রাস করে এবং সংসারে দারিদ্র্য ডেকে আনে। ফলে পারিবারিক অশান্তি, অস্থিরতা এবং হতাশার উদ্রেক হয়। পরিবারের সদস্যরা জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ ও সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

জনসংখ্যা নীতি

সাধারণত জনসংখ্যা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাই হচ্ছে জনসংখ্যা নীতি। সংকীর্ণ অর্থে- জনসংখ্যা নীতি বলতে জনসংখ্যা গঠন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পরস্পর সামঞ্জস্য ও স্বীকৃতিকে বুঝায়। বিস্তৃত অর্থে জনসংখ্যা নীতি হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যার দ্বারা সামাজিক অর্থনীতির প্রত্যাশিত বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া একটি দেশের যেকোন ক্ষেত্রের উপর হতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যেমন অর্থনীতি, মাথাপিছু আয়, জীবন যাত্রার মান, কৃষি, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক উন্নতিকে বাঁধাগ্রস্থ করে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলোর বিষম চক্র দেখানো হলোঃ

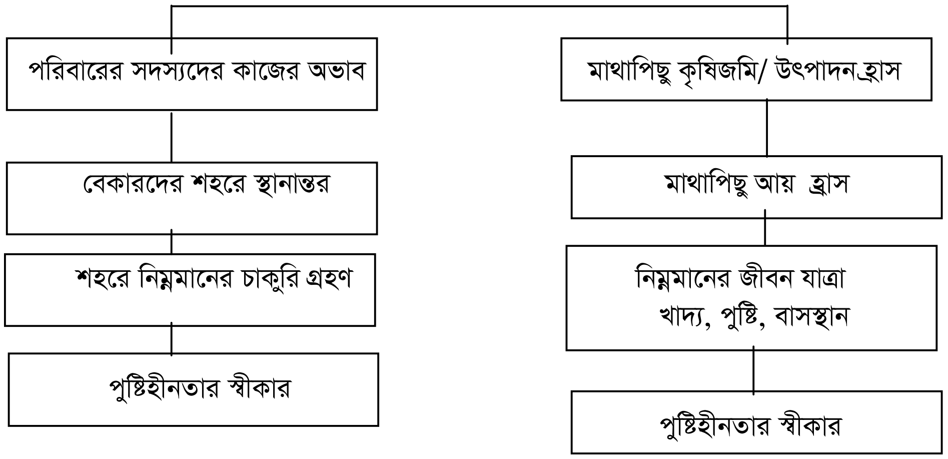
পরিবারের সদস্যদের কাজের অভাব
বেকারদের শহরে স্থানান্তর
শহরে নিম্নমানের চাকুরি গ্রহণ
পুষ্টিহীনতার স্বীকার
মাথাপিছু কৃষিজমি/ উৎপাদন হ্রাস
মাথাপিছু আয় হ্রাস
নিম্নমানের জীবন যাত্রা
খাদ্য, পুষ্টি, বাসস্থান
পুষ্টিহীনতার স্বীকার

উৎস ঃ পপুলেশন এডুকেশন ইন এশিয়া, সোর্স বুক, ইউনেস্কো রোয়াপ, ব্যাংকক ১৯৭৫।

জনসংখ্যা অতিরিক্ত বাড়ার ফলে উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরো কিছু গৌণ কারণ রয়েছে। যেমন- পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক দুর্যোগ ইত্যাদি। অবশ্যই এগুলো প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে জড়িত নয় তবে পরোক্ষভাবে প্রজন্ম প্রবণতাকে প্রভাবিত করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। তাই পরিবেশ দূষিত হয়। পরিবেশের ভারসাম্য এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকবে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ খুবই জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এখানে প্রধান কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

- বিজ্ঞাপন, শিক্ষা এবং প্ররোচনামূলক কার্যক্রম এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রধানত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এই কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থার উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ দান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তন করা।
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদি বিনা মূল্যে প্রদান করা।
- স্বাস্থ্যের অনুকূলে এবং থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজের পরিধিকে বিস্তার করা।
- স্বেচ্ছামূলক বন্ধ্যাকরণকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন: ভাতা দান, আধুনিক প্রণালী, সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার নিশ্চয়তা প্রদান, ডাক্তার এবং সহকারীদের অতিরিক্ত সামাজিক সুবিধা দান।
- বিয়ের বয়স বিলম্বিত করা এবং বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ এবং মেয়েদের ১৮ স্থির করা।
- অতিরিক্ত সন্তানাদির জন্ম সরকার হতে অনুমতির ব্যবস্থা করা কিংবা কর আরোপ করা।
- অতিরিক্ত সন্তানের জন্য মাতৃত্বজনিত ছুটি বাতিল করণ।

- বিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়োগ, বিবাহ, পেনশন এবং পাসপোর্টের জন্য আবশ্যকীয় তালিকাভুক্তি আইনের সংশোধন।
- গর্ভধারণ প্রতিরোধমূলক শিক্ষা সচেতনতা ও মটিভেশনাল কর্মকান্ড বাড়ানোর উপর জোরালোধর্মী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা।
- পরিবার পরিকল্পনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরকরণ।
- মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনাকে একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় আনয়ন করা।
- শিক্ষা-বিশেষত নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।
- পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি দম্পতিদের পছন্দ অনুযায়ী উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহারের লক্ষ্যে একাধিক জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী সেসব গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান।
- পরিবার পরিকল্পনার শিক্ষা এবং বিতরণ ব্যবস্থায় একটি বহুখাতভিত্তিক কৌশলের উন্নয়ন সাধন।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশেষত: এন.জি.ও এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ।
- সেবার সম্প্রসারণ এবং সেগুলোর মানোন্নয়ন।
- দেশের অভ্যন্তরে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ এবং সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধির পাশাপাশি মানব সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

উপরে উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যদিও পদ্ধতিগুলি যথাযথ বাস্তবায়ন বেশ কঠিন তবুও বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু পদ্ধতি কার্যকর করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এর ফলে দেশে প্রজনন হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সহায়তা প্রয়োগ বেশ প্রশংসার দাবীদার। জনসংখ্যার বিষয়ে সরকার বিদ্যালয় ও সমাজ উভয়ের প্রতিই সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত

করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে জনসংখ্যা বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে ভবিষ্যতে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং তাদের মাধ্যমে পিতা মাতা, অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্যদের সাথে জনসংখ্যা সমস্যা জনিত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান সহজেই হতে পারে।

মূল্যায়ন

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল আলোচনা করুন।

৩. জনসংখ্যা নীতি ব্যাখ্যা করুন।

৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও উপায় বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর:

পর্ব-ক

কাজ-১

ক্রমিক	প্রশ্ন	উত্তর
১	পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ছিল?	২৫ থেকে ৩০ কোটির মধ্যে ছিল
২	২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত হতে পারে?	১৫ কোটি
৩	বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার সংখ্যা কত?	৬০০ কোটি
৪	১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত হয়েছিল?	১০০ কোটি
৫	উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ আকার ধারণ করে কখন থেকে?	বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে

কাজ-২, কাজ-৩

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ ও গ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-১ **অধিবেশ-৪**

অর্থনীতির নাজুকতা

ভূমিকা

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হল দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা। কোন দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা নির্ভর করে সে দেশের শিল্প কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পপণ্যের বাজার, পরিবহণ ব্যবস্থা, পুঁজি বিনিয়োগ, দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ-এর প্রাপ্যতা, ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, রাষ্ট্রের সুশাসনের উপস্থিতি এবং সুস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের প্রাপ্যতা ও শিল্পপণ্যের বিশাল বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়।

অর্থনৈতিক মন্দার ফলে যে কোন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও আয়ের উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের অর্থনীতিতে গতি আসবে যখন মানুষের ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি হবে এবং দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করলে এতে দেশের মুদ্রাস্ফীতিও বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি এবং দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটলে তাও দেশের অর্থনীতিকে নাজুক করে তুলে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- অর্থনৈতিক নাজুকতার সাথে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক নাজুকতার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- সমাজে আর্থিক অস্বচ্ছলতার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আর্থিক অস্বচ্ছলতার ফলে সৃষ্ট সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা উল্লেখ করতে পারবেন।
- উন্নত ও অনুন্নত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক: অর্থনৈতিক নাজুকতার সাথে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার সম্পর্ক এবং কারণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা জানেন অধিক জনসংখ্যা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের জীবন মান নিচু স্তরে নেমে যায়। দেশ পিছিয়ে পড়ে শিক্ষায়। মানব জীবন অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতায় আক্রান্ড় হয়। শিশু মৃত্যুহার বেড়ে যায়, ফলে পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে।

কাজ-১

বন্ধুরা, নিচের ছকটি পূরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নাজুকতার কারণগুলো খুঁজে বের করুন-

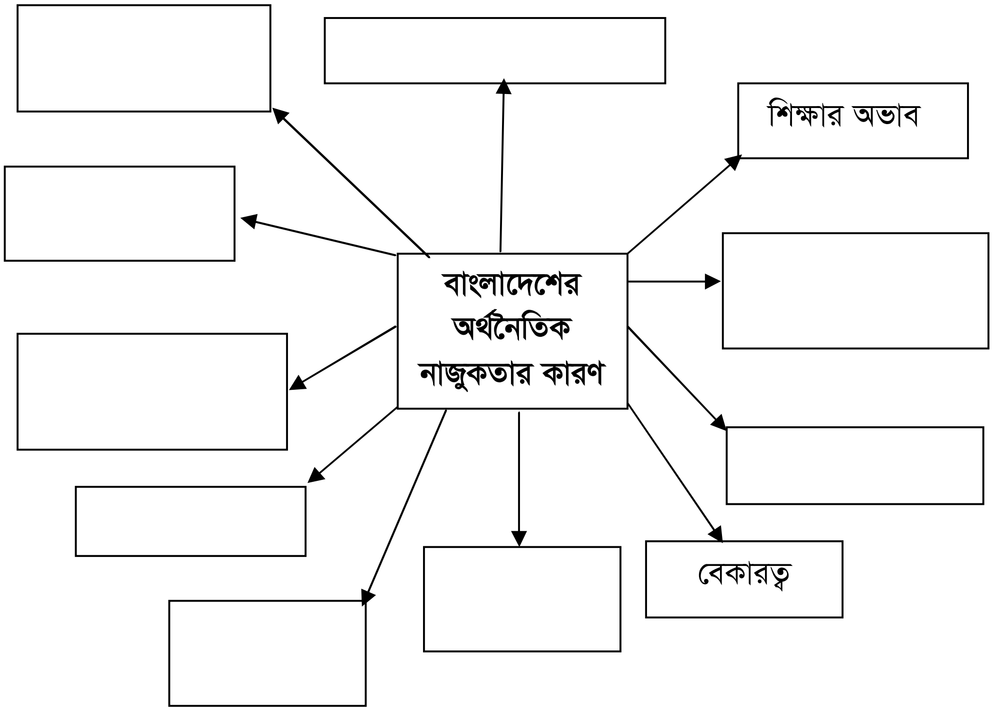

পর্ব-খ : আর্থিক অস্বচ্ছলতার ফলে সৃষ্ট সমস্যা

উন্নয়নশীল দেশে পুষ্টিহীনতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে পুষ্টিকর খাবারের অভাব ঘটে। মানুষ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে পারে না।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ সহজে রোগাক্রান্ত হয়, সুচিকিৎসার অভাবে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

উন্নয়নশীল দেশে পুষ্টিহীনতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ডায়রিয়া, হাম, আমাশয় ইত্যাদি এসব অঞ্চলের নিত্যসাথী এবং এর যেকোন একটি রোগ হওয়ার পর দেহের পুষ্টিমান অত্যধিক পরিমানে নেমে যায়। অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রভাবে মৃত্যু ও প্রবণতা বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার বেড়ে যায়। পুষ্টিহীন পরিবারে সকলেই দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং দুর্বল ব্যক্তি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অধিক সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে গর্ভবর্তী হওয়ার কারণে মায়েদের স্বাস্থ্য অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে এবং প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যুপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বেশি সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে মায়ের যেমন অপুষ্টি

ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে তেমনি তার গর্ভজাত সন্তানও প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ও রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এভাবেই পুষ্টিহীন সমাজে শিশু মৃত্যু বেশি হয় ফলে পিতামাতা জন্মনিয়ন্ত্রণে অনুৎসাহিত হয় পরিণামে মানুষের জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

পুষ্টিহীনতার আরও কারণ হলো সাধারণ মানুষ খাবারের পুষ্টিমান (Food value) জানেনা। কোন খাবারে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান আছে তা না জানার জন্যও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাছাড়া স্বল্পমূল্যে অনেক খাবার আছে যেগুলোর পুষ্টিমান (Food value) দামী খাবারের সমান। সে বিষয়েও জনগণ অজ্ঞাত রয়েছে। তাই স্বল্প আয়যুক্ত জনগণের খাবারের পুষ্টিমান জেনে খাওয়া উচিত।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আর্থিক অসচ্ছলতার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী সমস্যা তৈরি হতে পারে? সম্ভাব্য সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে একটি তালিকা করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

পর্ব-গ: উন্নত ও অনুন্নত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনা

শিল্পোন্নত দেশসমূহে ১৯৫০ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮৪১ মার্কিন ডলার। ১৯৬০ সালে তা দাঁড়ায় ৪১৯৭ মার্কিন ডলারে এবং ১৯৮০ সালে দাঁড়ায় ৯৬৮৪ মার্কিন ডলারে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে শিল্পোন্নত দেশসমূহের মাথাপিছু আয়ের হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার নির্ণয় করুন এবং একইভাবে ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৮০ সালে শিল্পোন্নত দেশসমূহের মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি /হ্রাস নির্ণয় করুন।

শিল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু আয়

১৯৫০	১৯৬০	১৯৮০	১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে বৃদ্ধি	১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৮০ সালে বৃদ্ধি
৩৮৪১	৪১৯৭	৯৬৮৪		

ইউনিট-১ অধিবেশন-৪

মূল শিখনীয় বিষয়

অর্থনীতির নাজুকতা

অধিক জনসংখ্যা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। জাতীয় উন্নয়নের প্রধানতম শর্ত হল দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা। দেশের অর্থনীতিতে গতি আসবে যখন মানুষের ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি হবে এবং দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করলে এতে দেশের মুদ্রাস্ফীতিও বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতি এবং দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটলে তাও দেশের অর্থনীতিকে নাজুক করে তুলবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির নাজুকতার কারণ

১) স্বল্প মাথাপিছু আয়।

২) কৃষির উপর নির্ভরশীলতা।

৩) শিল্পে অনগ্রসরতা

৪) মূলধনের অভাব।

৫) শিক্ষার অভাব।

৬) কারিগরি জ্ঞানের অভাব।

৭) দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব।

৮) প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার।

৯) ব্যাপক বেকারত্ব।

১০) প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন।

১১) বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা।

১২) দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো।

১৩) প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ।

১৪) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র।

১৫) দ্বৈত অর্থনীতি।

১৬) বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা।

১৭) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

১৮) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব।

১৯)অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল জনসংখ্যা।

২০) আমদানির উপর নির্ভরশীলতা।

২১)সরকারের অধিক ব্যয়।

২২) অপব্যয় ও অপচয়।

২৩) অনিয়ম ও দূর্নীতি।

অতএব উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করতে পারলে বাংলাদেশেও উন্নত দেশসমূহের মত একদিকে যেমন নিত্য ব্যবহার্য ও বিলাসজাত দ্রব্যের যোগান থাকবে প্রচুর, তেমনি অন্যদিকে চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। বেকারত্বের হার কম থাকবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা বিরাজ করবে।

আমাদের বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। এর একটি প্রধান কারণ আমাদের দেশের জনসংখ্যার আধিক্য। তাছাড়া জনসংখ্যার একটি অংশ হল বেকার। ফলে আমাদের জাতীয় উৎপাদন অত্যন্ত কম। তাছাড়া আয়ের সিংহভাগ খাদ্য ও বস্ত্র ক্রয়ের জন্য খরচ হয়ে থাকে। পৃথিবীব্যাপী যেখানে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে সেই প্রভাব উন্নয়নশীল দেশের জনগণের জীবনযাত্রার উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করছে।

অর্থনৈতিক মন্দার ফলে যে কোন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও আয়ের উৎস ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের জীবন মান (Quality of life) নিচু স্তরে নেমে যায়। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতায় আক্রান্ত হয়। শিশু মৃত্যুহার বেড়ে যায় এবং তারা পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। অনুন্নত দেশে পারিবারিক নিরাপত্তার উৎসই হচ্ছে সন্তান, অধিক সন্তান পরিবারের জন্য জীবন বীমার মত কাজ করে। বাংলাদেশের মত আরো অনেক দেশে যেহেতু বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার ভরণ পোষণের কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই। সেজন্য তাদের একমাত্র ভরসা থাকে অধিক সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান। মরে বেচে যেসব সন্তান থাকবে তারাই আগামী দিনে পরিবারের নিরাপত্তা দিতে পারবে বা অক্ষমদের সেবা শুশ্রুষার ও দেখাশুনার দায়িত্ব নেবে। এ ধরনের বিশ্বাস থেকেই স্বল্প আয়ের পরিবারে তথা উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সারণী-১

তিন দশকব্যাপী বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ও গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধি

মাথাপিছু GNP : ১৯৮০ সালের মার্কিন ডলার হিসেবে				জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড়		
	১৯৫০	১৯৬০	১৯৮০	১৯৫০-৬০	১৯৬০-৭০	১৯৭০-৮০
শিল্পোন্নত দেশ	৩,৮৪১	৪,১৯৭	৯,৬৮৪	১.২	১.০	০.৭
মধ্য আয়ভূক্ত দেশ	৬২৫	৮০২	১,৫২১	২.৪	২.৫	২.৫
নিম্ন আয়ভূক্ত দেশ	১৬৪	১৭৪	২৪৫	১.৯	২.৫	২.৩

উৎস ঃ World Development Report, World Bank, 1980.

বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা

সারণীতে দেখানো হয়েছে যে, শিল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯৫০ সালে যেখানে ছিল ৩৮৪১ মার্কিন ডলার তা তিন দশক পর প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৯৬৮৪ মার্কিন ডলারে। তখন বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২ থেকে প্রায় অর্ধেক কমে দাড়ায় ০.৭ এর মধ্যে। নিম্ন আয়ভূক্ত দেশে তিনদশক সময়ে তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় মাত্র ১৬৪ ডলার থেকে দেড়গুন বেড়ে ২৪৫ মার্কিন ডলারে উঠে, একই সময়ে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ১.৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৩ এ উন্নীত হয়। এতে বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম শক্তিশালী প্রভাবক। যে দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় কম সেদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই বেশি। সুতরাং দরিদ্রতার সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বোঝানোর জন্য কতগুলি নির্বাচিত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং তারজন্য বার্ষিক শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে সারণী-২ এ দেখানো হলো।

সারণী-২

কয়েকটি দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দেশ	মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন ডলারে (১৯৮৮ হিসেবে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৮৮ হিসেবে)
বাংলাদেশ	১৭০	২.৭
ভারত	৩৪০	২.০
শ্রীলংকা	৪২০	১.৮
ইথিওপিয়া	১২০	৩.০
জাপান	২১,০২০	০.৫
যুক্তরাষ্ট্র	১৯,৮৪০	০.৭
জার্মানী	১৬,৫৭০	০.০

উৎস ঃ World Population Data Sheet, PRB, 1988, Human Development Report, 1991, UNDP.

উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে সব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বেশি অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বল্প আয়ভুক্ত দেশের তুলনায় অনেক কম। যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর মাথাপিছু জাতীয় আয় হলো যথাক্রমে ১৯৮৪০ এবং ১৬৫৭০ মার্কিন

ডলার, এ দু'টি দেশের শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.৭ ও ০.০ যা উন্নয়নশীল দু'টি দেশ, বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনায় অনেক কম। ভারত বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় যথাক্রমে ৩৪০ ও ১৭০ মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.০ ও ২.৭ (সারণী-২)।

পুষ্টিহীনতার আরও কারণ হলো সাধারণ মানুষ খাবারের পুষ্টিমান (Food value) জানেনা। কোন খাবারে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান আছে তা না জানার জন্যও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাছাড়া স্বল্পমূল্যে অনেক খাবার আছে যেগুলোর পুষ্টিমান (Food value) দামী খাবারের সমান। সে বিষয়েও জনগণ অজ্ঞাত রয়েছে। তাই স্বল্প আয়যুক্ত জনগণের খাবারের মান জেনে খাওয়া উচিত।

মূল্যায়নঃ

১. অর্থনৈতিক নাজুকতা বলতে কী বোঝায়?

২. আর্থিক অস্বচ্ছলতা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কী প্রভাব ফেলে উল্লেখ করুন।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন - আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সম্ভাব্য উত্তর:

পর্ব-ক

কাজ-১

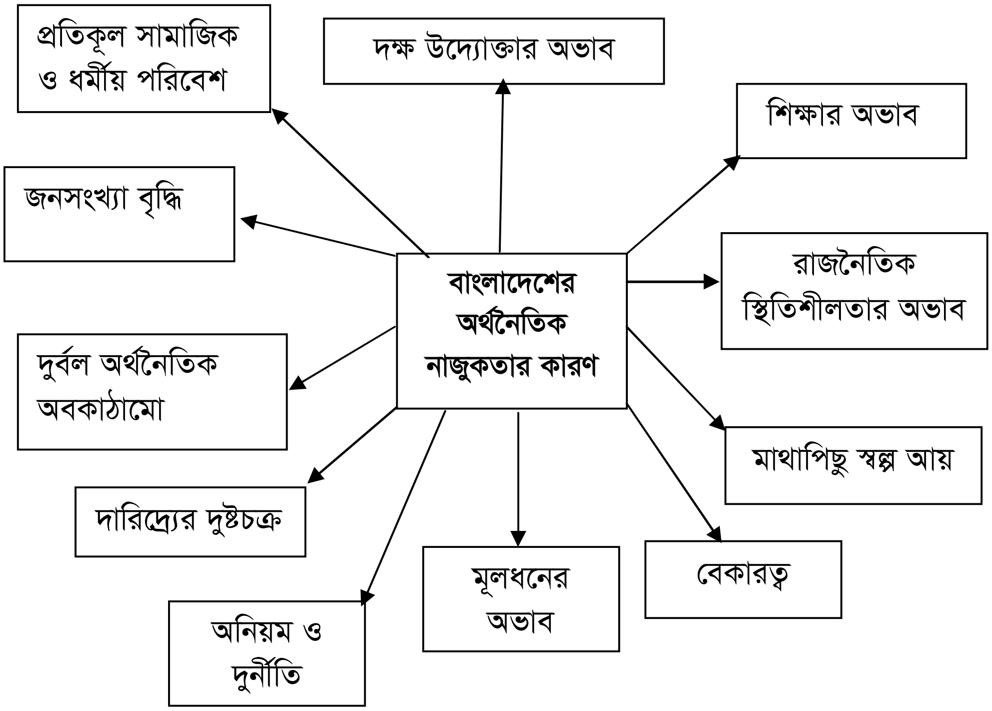
প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ
দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব
শিক্ষার অভাব
জনসংখ্যা বৃদ্ধি
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নাজুকতার কারণ
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব
দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো
মাথাপিছু স্বল্প আয়
দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র
বেকারত্ব
মূলধনের অভাব
অনিয়ম ও দুর্নীতি

পর্ব-খ

কাজ-১

- পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে না।
- অপুষ্টির কারণে পড়াশুনা করতে পারে না।
- প্রয়োজনীয় বইপত্র, স্কুল ড্রেস ইত্যাদি জোগাড় করতে অসুবিধা হয়।
- শারীরিক অসুস্থ্যতায় ঠিকমত স্বাস্থ্যসেবা পায় না ফলে পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে ইত্যাদি।

পর্ব-গ

কাজ-১

১. বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণের অভাব
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্রের অভাব
৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকের অভাব
৪. মানসম্পন্ন বইপত্রের অপ্রতুলতা
৫. জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৫**

শহরায়ন

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত শহরায়ন হচেছ এবং শহরায়নের ফলে শহর এলাকা আরো বেশি বিকশিত হচেছ। সাধারণতঃ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে মানুষের শিক্ষা ও বাণিজ্য নির্ভর পরিবেশে আগমন ঘটলে তাকে শহরায়ন বলে। শহরায়ন হলো প্রথাগত জীবন ও পেশা থেকে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যিক ভিত্তিক পেশায় রূপান্তরিতকরণ। এটা শুধু ব্যক্তি বা দলের পেশাগত পরিবর্তন নয় বরং কাজের প্রতি মানুষের মানসিক ও শ্রম বিভাগের ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতাকে বুঝায়। জাতিসংঘের মতে- “শহরায়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যাতে দেশের জনসংখ্যার একটি ক্রমবর্ধমান অংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করে”। সমাজবিজ্ঞানী Miechel এর মতে “শহরায়ন হচেছ শহুরে হবার পদ্ধতি যা কৃষি পেশা থেকে অন্য পেশায় রূপান্তরের এবং সাথে সাথে তাদের ব্যবহারিক রীতিনীতি পরিবর্তন”।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চোখ বন্ধ করে এক মিনিট চোখের সামনে ঢাকা শহর অথবা যে কোন জেলা শহরের ছবিটি মনে করুন যেখানে আছে ভাল স্কুল, কলেজ, রাস্তা-ঘাট, যাতায়াত ব্যবস্থা, হাসপাতাল, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের গ্রামের একটি ছবি ভাবুন, যেখানে নেই হাসপাতাল অথবা ভাল স্কুল, কলেজ অথবা কর্মসংস্থানের সুযোগ। তারপর একটু চিন্তা করুন, আপনার বসবাসের জন্য আপনি কোন স্থানটি বেছে নিবেন এবং কেন? তারপর নিচের ছকে প্রধান তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।

কাজ-১

১.

২.

৩.

পর্ব-খ : শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন সমস্যা

বাংলাদেশে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে গ্রামের তুলনায় শহরে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকায় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহরগুলো ঘনবসতিপূর্ণ হচ্ছে এবং নগরবাসী বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। চলুন নিচের ছকটি পূরণের মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করি এবং প্রয়োজনে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেই।

কাজ-১

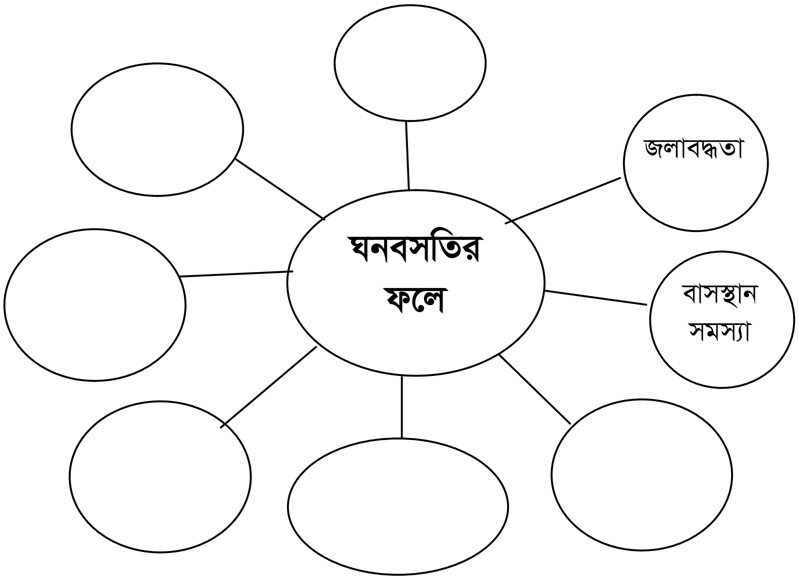
ঘনবসতির ফলে
জলাবদ্ধতা
বাসস্থান সমস্যা

পর্ব-গ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান

উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ার ফলে ক্রমেই শহরে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা বেড়ে চলেছে। এ সমস্যাগুলো দূর করতে হলে গ্রামে কলকারখানা স্থাপন, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, কৃষিপণ্য সরবরাহের সুযোগ করা, দুর্যোগ মোকাবিলা করা, ভাল স্কুল কলেজ ও হাসপাতালের ব্যবস্থা করা জরুরি। যাতে করে গ্রামের মানুষ নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে এবং নিরাপদে বসবাস করতে পারে। এছাড়া সরকার শহরগুলো উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর যে অর্থ বরাদ্দ করেন তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করে শহরের রাস্তা-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী, হাট-বাজার, বাসস্থান, স্বাস্থ্য সেবাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধাসমূহের উন্নয়নসাধন করা দরকার।

কাজ-১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, চলুন এবার আমরা নিচের ছকে পাঁচটি সমস্যা ও তার সমাধান উল্লেখ করি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমস্যা ও তার সমাধান

সমস্যা	**সমাধান**
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

শহরায়ন

শহরায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মানুষের শিক্ষা ও বাণিজ্যিক ভিত্তিক শহরের জীবন ব্যবস্থ'ায় উত্তোরণ ঘটায়। নগরায়নের প্রধান দুটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. ধাক্কাজনিত ধারা (Push factor)

২. টানজনিত(আকৃষ্ট) ধারা (Pull factor)

১। ধাক্কাজনিত (Push factor) ঃ এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল গ্রাম এলাকার অব্যবস্থ'া, যেমন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেকারত্ব, খরা ইত্যাদি কারণে গ্রাম ছেড়ে জনগণ শহরমুখী হয় এবং শহর এলাকায় লোকজন ভীড় করে।

২। টানজনিত (আকৃষ্ট) (Pull factor) ঃ এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল নগর এলাকার সুযোগ-সুবিধা, যেমন-কর্মসংস্থ'ানের সুযোগ, জীবনযাত্রার মানের কারণে গ্রাম থেকে শহর এলাকার লোকজন ভীড় করে।

নিম্নে শহরায়নে স্থ'ানান্তর হবার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) ধাক্কাজনিত কারণ (Push factor) ঃ এ কারণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রামীণ অব্যবস্থ'া, নৈরাশ্য এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সাধারণ মানুষকে শহরমুখী হতে অনুপ্রাণিত করে। নিম্নে ধাক্কাজনিত কারণগুলো উল্লেখ করা হলঃ

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Disaster)ঃ পল্লী এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, জ্বলোচ্ছ্বাস সম্প্রতি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেল সিডর এবং আইলা এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসা ইত্যাদি কারণগুলো গ্রামে বসবাসের অনুপযোগী করে তোলে এবং গ্রামীণ জনগণ বেঁচে থাকার তাগিদে শহরমুখী হয়।

২. গ্রামীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত (Rural conflict)ঃ পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া আছে গ্রামীণ রাজনীতি, জমি, প্রতিপত্তি ও বিভিন্ন সম্পর্ককে কেন্দ্র

করে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। এর ফলে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো গ্রাম ছেড়ে শহর এলাকায় গমন করে।

৩. বেকারত্ব (Unemployment)ঃ পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অব্যবস্থা বিরাজ করে। এর অন্যতম হল কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব। আমাদের পল্লী এলাকার জনগণ প্রধানত কৃষিজীবী এবং কৃষির উপর নির্ভর করে তারা জীবন নির্বাহ করে। কিন্তু কৃষি দ্বারা সর্বক্ষেত্রে ও সকলে তাদের আয় রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাছাড়া আছে খরা, বন্যা, আছে মঙ্গা এলাকা এবং বর্ষাকালে যখন জমিতে পানি থাকে তখন কোন কাজ থাকে না এবং সারা বছর তারা কাজের সুযোগ পায় না। এজন্য পল্লী এলাকার লোকেরা কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়।

৪. গ্রামীণ দারিদ্র্য (Rural povetry)ঃ গ্রামের জনগণ তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। এজন্য তারা সারা বছর খাদ্যাভাব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে দিন কাটায়। গ্রামীণ জীবনে অর্থের সুযোগ-সুবিধার অভাবে শহরমুখী হয় এবং শহরে বসবাস শুরু করে।

৫. নিরাপত্তার অভাব (Lack of Security)ঃ গ্রামীণ এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভাব রয়েছে। বিশেষ করে পুলিশ, বি.ডি. আর এবং আনসার বাহিনী প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে দায়িত্ব পালনে সুযোগ পায় না, ফলে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। ফলে জীবনের ভয়ে গ্রামের জনগণ শহরমুখী হয় এবং শহর এলাকায় বসবাস গড়ে তোলে।

খ. টানজনিত (আকৃষ্টজনিত) কারণ (Pull factor) ঃ শহর এলাকার সুযোগ-সুবিধা গ্রামের জনগণকে আকৃষ্ট করে এবং গ্রাম এলাকা ত্যাগ করে শহর এলাকায় বসবাস শুরু করে। নিম্নে আকৃষ্টজনিত কারণগুলো উল্লেখ করা হল :

১. কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা (Employment opportunity)ঃ শহর এলাকার কাজের সুযোগ-সুবিধা, যেমন-দক্ষ, অদক্ষ উভয় শ্রেণীর জনগণের শহর এলাকায় কাজের সুযোগ রয়েছে। এজন্য জনগণ শহরে এসে প্রায় সকলেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। শহরে উচ্চ থেকে নিম্ন সকল ধরনের কাজের সুযোগ আছে। এখানে কলকারখানা, গার্মেন্টস

ফ্যাক্টরী এবং বর্তমানে বহুতল ভবন নির্মাণ কাজে প্রচুর শ্রমিকদের প্রয়োজন। তাই কাজের সন্ধানে গ্রামের লোকজন শহরে আসে।

২. শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা (Educational facilities)ঃ শহর এলাকা উন্নত শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে এবং শহর এলাকায় সকল ধরনের উচ্চ শিক্ষার সুবিধা রয়েছে। যেমন-কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার সুযোগের জন্য মানুষ শহরমুখী হয়।

৩. নিরাপদ জীবন (Secured Life)ঃ শহর এলাকা গ্রামের তুলনায় তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। ফলে গ্রামীণ জনগণ শহরে এসে নিরাপত্তাবোধ করে এবং সুস্থ সাবলীল জীবনযাপন করে।

৪. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা (Economic solvency)ঃ শহর অঞ্চলে জনগণ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে আয় উপার্জন করার চেষ্টা করে এর ফলে শহরের লোকজন আত্মনির্ভরশীল যা গ্রামীণ জনগণের আকর্ষণের মূল কারণ।

৫. শহর এলাকায় আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতাঃ শহর এলাকায় জনগণের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সংস্রব অধিক। এজন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার জন্য পরস্পরের সম্পর্ক কাজ করে যা গ্রামীণ জনগণকে শহর এলাকায় আকৃষ্ট করার অন্যতম কারণ।

উপরোক্ত কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের গ্রামের জনগণ প্রতিবছর বিপুলভাবে শহর এলাকায় ভিড় করে শহর এলাকাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে চলেছে। মূলত শহরায়ন সম্ভব হচেছ শহর এলাকার সুযোগ-সুবিধার প্রতি জনগণের আকর্ষণজনিত কারণে।

* শহরায়নের সাথে যুগপতভাবে জড়িত থাকে মানুষের জীবনমান, আবাসিক সমস্যা, পরিবেশ দূষণ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। জনসংখ্যার পেক্ষাপটে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিল্প, আন্ডর্জাতিক বাণিজ্য রয়েছে জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রধান প্রধান শহরে নতুন করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে তার আকর্ষণে বহু লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে এই শহরমূখী জনতার ভিড় উন্নত দেশের চাইতে উন্নয়নশীল দেশেই সর্বপেক্ষা বেশি দেখা যাচ্ছে। Brown et al (১৯৭৬) তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এই শহরমূখী জনতার ভিড় এটাই নির্দেশ করে যে, শহরের

সুযোগ সুবিধার চেয়ে গ্রামীণ জীবনের নৈরাশ্যই তাদের দেশান্তরিত হতে বাধ্য করছে। তাছাড়া ধর্মীয় গোড়ামী, কাজের ক্ষেত্র সীমিত, হাতে নগদ টাকা না থাকা ইত্যাদি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শহর কেন্দ্রগুলিতে বার্ষিক ৮ থেকে ১০ ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ। এইসব অঞ্চলের অনুন্নত দেশগুলিতে প্রতি ২৫ থেকে ৩০ বছরে তাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হবে অথচ একই দেশের উল্লেখযোগ্য শহরের কেন্দ্রগুলোতে ১০ থেকে ১৫ বছর সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিগুণিত হয়ে যাচেছ।

গ্রামের জীবন ধারার বিপরীত হলো শহর জীবন। এখানে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবেশ। রাস্তা ঘাট পরিকল্পিত যানবাহন পর্যাপ্ত। শহর জীবন আধুনিক এবং আকর্ষণীয়। শহর জীবনের প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণ দিনে দিনে বেড়ে চলছে। এতে শহরের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ। স্থান সংকুলান হচেছ না। শহরের নিদিষ্ট আয়তনের এলাকায় মানুষের কাজের ক্ষেত্র বিশাল। শহরে জীবিকা নতুন নতুন পথ প্রতিনিয়ত আবিস্কৃত হচেছ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মানসম্মত ও উচচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ শহরে অবস্থিত। রোগ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য শহরে পাওয়া যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রাদি। শহরে বিনোদনের জন্য রয়েছে খেলার মাঠ, পার্ক, পাঠাগার, ক্লাব ইত্যাদি। শহরে জনগোষ্ঠী কর্মব্যস্ত। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে। ফলে গ্রামের মানুষ শহরমূখী হচেছ।

শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমস্যা ও তার সমাধান

বাংলাদেশের শহর অঞ্চলের মানুষও নানা অসুবিধার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। এ সমস্যাগুলো নগর এলাকাকে কলুষিত করে তুলছে এবং নগরবাসী এ সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। সমস্যাগুলো হচেছ ঃ

১। পানীয় জলের অভাব ঃ শহরে জনসংখ্যা ধারণ ক্ষমতার বাইরে থাকাতে এবং শহরে বহুতল ভবন প্রতিনিয়ত নির্মাণ হচেছ ফলে পানির অভাব অনেক এলাকায় তীব্র আকার ধারণ করছে।

২। নোংরা বস্তি জীবন ঃ গ্রাম থেকে এসে লোকজন শহরে বস্তি এলাকায় বসবাস করছে সেখানে নেই কোন আধুনিক, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা।

৩। বাসস্থান সমস্যা ঃ শহরে বাসা ভাড়া অধিক তাই সবাই সামর্থ অনুযায়ী সুবিধামত ও ভাল জায়গায় ইচছা করলেই বসবাস করতে পারছে না।

৪। পরিবেশ দুষণ ঃ শহর এলাকায় অধিক লোকের বসবাস। এজন্য যানজট এবং ময়লা আবর্জনার স্তুপ, কলকারখানার নোংরা পানি, কালো ধোঁয়া, মলমূত্র, খোলা ড্রেন ইত্যাদি শহর এলাকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর ফলে পরিবেশ দূষণ হয় এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শহরবাসীরা তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে। পরিবেশ দূষণের ফলে শিশুদের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

৫। ফুটপাত দখল ঃ গ্রাম থেকে আসা মানুষেরা কর্মসংস্থানের জন্য ফুটপাত দখল ক'রে ব্যবসা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করছে। এতে করে জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা হচেছ এবং যানজট বাড়ছে।

৬। শহর বাসী জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শহরে গ্রামের মতো ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পাওয়া বড় কঠিন।

৭। শহরের সব জায়গার পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়, তাছাড়া হাট বাজার ইত্যাদি অনেক সময়ে পরিস্কার পরিচছন্ন থাকে না।

৮। শহরের আরেকটি সমস্যা হল নবাগত গ্রামবাসীদের শহরে আসার পর পরই প্রজনন প্রবণতা সাময়িকভাবে হলেও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এতে শহরের জনসংখ্যা আরো তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে এবং সৃষ্ট সমস্যার পরিধির আরো বিস্তার ঘটায়।

৯। শহরগুলোতে জন স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত, ফলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

১০। প্রতিনিয়ত বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ ও পানি দুষণ হচেছ।

১১। একটু বৃষ্টি হলেই শহরে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

১২। নগর দারিদ্র্য ঃ নগর দারিদ্র্য নগর এলাকার জনগণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সমস্যাটি সাধারণতঃ বস্তিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশের নগর এলাকার প্রায় ৩০% মানুষ দারিদ্র্যের শিকার।

১৩। অসুস্থতা বা রোগব্যাধি ঃ নগরবাসী নানা প্রকার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়। তারা সাধারণতঃ চুলকানি, পেটের পীড়া, জ্বর, আমাশয়, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে ভোগে। এসব রোগগুলো সাধারণতঃ বস্তিবাসীদের হয়। শহরের ধনী শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচচ রক্তচাপ এসব রোগে ভোগে। শহরের গতিশীল জীবন এবং দূষিত পরিবেশ এজন্য অনেকটা দায়ী।

১৪। নারী নির্যাতন ঃ শহর এলাকায় দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এই প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। বস্তি এলাকায় কম বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের অনেকেরই বিবাহ বিচেছদ ঘটে। এরা মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়।

১৫। তালাক/বিচেছদ এবং বহুবিবাহ ঃ এই সমস্যাটি বস্তিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা এদের সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত দুর্বল এবং এরা সচরাচর বিভিন্নভাবে বিয়ে করে আবার বিয়ে ভাঙ্গে। যা স্বাভাবিকভাবে পারিবারিক জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে।

১৬। শিশু শ্রম ঃ সাধারণত: দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিশু শ্রম দেখা দেয়। বাংলাদেশে ৫-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা শিশু শ্রমের সাথে যুক্ত হয়। শিশু শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জন করে তা শিশুদের এবং তাদের পরিবারের খরচ মেটাতে ব্যয় হয়। শহর এলাকায় গৃহ পরিচালিকা এবং গার্মেন্টস শিল্পে অনেক শিশু শ্রমিক নিয়োজিত থাকে। সরকারিভাবে যদিও শিশু শ্রম নিষিদ্ধ কিন্তু পেটের দায়ে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুরা নিয়োজিত আছে।

১৭। অপরাধ ও শিশু অপরাধ ঃ শহর এলাকায় বিভিন্ন ধরণের অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সন্ত্রাস, চোরাচালানি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। এসব সমস্যার সাথে শহর এলাকার একটি বিরাট অংশ জড়িত। এর ফলে শহর জীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ে। এছাড়া কিশোর অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া আছে মাদক ব্যবসা। এর সাথে জড়িত আছে উচচবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্তরা।

১৮। ভিক্ষাবৃত্তি ঃ শহর এলাকার ভাসমান এবং বস্তিবাসী চরম দরিদ্র শ্রেণী। এরাই এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত। যদিও সামাজিকভাবে এ পেশাটি ঘৃণার চোখে দেখা হয় তবুও শহর এলাকার একটি বিরাট অংশ ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত। সাধারণত: পঙ্গু ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকার শহরগুলো উন্নয়ণের জন্য প্রতি বছর বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করছেন। সে বরাদ্দ আরও বাড়ানো দরকার। রাস্তা ঘাট পয়ঃপ্রণালী, হাট বাজার ইত্যাদির উন্নয়ন সাধন করা দরকার। ছিন্নমূল মানুষের জন্য ঢাকা শহরের বাহিরে আবাসন ব্যবস্থা করা দরকার। শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সরকারি স্বাস্থ্য সার্ভিস আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন মূখী প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার। জলাবদ্ধতা দুরীকরণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার। ফুটপাত খালি করে জনগণের চলাচলের ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। গ্রামে গঞ্জে শিল্প কারখানা তৈরি করে আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রামে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, কৃষি কাজে ব্যবহৃত সার, বীজ ও কৃষি পণ্য সময়মত সরবরাহ করা, আইন শৃঙ্খলা জোরদার করা, কলকারখানা (ছোট, বড়, মাঝারী যে কোন ধরনের) প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় মানুষের বাঁচার অধিকার জোরদার করা, আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা সেবা উন্নতিকরণ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে গ্রামীণ জীবনকে সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে শহরের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ রোধ করা সম্ভব হবে না।

মূল্যায়নঃ

১. শহরায়ন বলতে কী বোঝেন?

২. দ্রুত শহরায়নের ফলে ভবিষ্যতে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৩. বাংলাদেশের গ্রামগুলোর উন্নয়নে আপনি কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন তা উল্লেখ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক :

কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ

কাজ-১

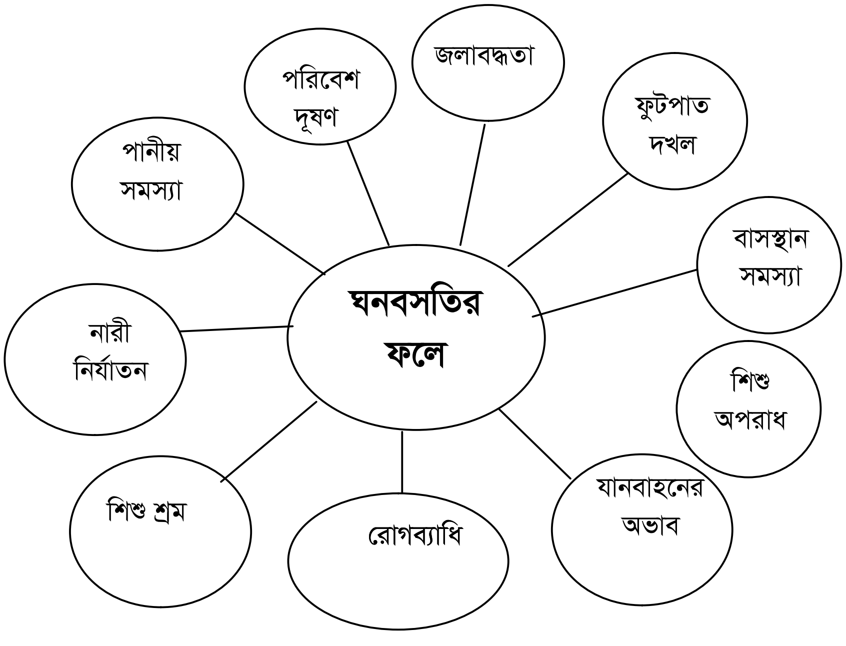
ঘনবসতির ফলে
পরিবেশ দূষণ
জলাবদ্ধতা
ফুটপাত দখল
পানীয় সমস্যা
বাসস্থান সমস্যা
নারী নির্যাতন
শিশু অপরাধ
শিশু শ্রম
রোগব্যাধি
যানবাহনের অভাব

পর্ব-গ

কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৬**

সাক্ষরতা

ভূমিকা

একজন মানুষের মনের ও শরীরের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। দৈনন্দিন জীবনে সকল রকমের প্রয়োজন মেটানো এবং সুন্দর ও সাবলীলভাবে জীবন যাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন হয় তার সবকিছু জানা বা করতে পারাই হলো শিক্ষা। আর শিক্ষার প্রথম পাঠ হল সাক্ষরতা। খুব সাধারণ অর্থে সাক্ষরতা মানে অক্ষর চিনে পড়তে পারা, লিখতে পারা ও হিসাব-নিকাশ করতে পারা।

সাক্ষরতা অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে শিখনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সাক্ষরতা মানুষকে জীবন যাপন প্রণালী উন্নত করার জন্য নিজ নিজ সমাজে বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার এবং জেনে শুনে পছন্দ করার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- সাক্ষরতা কাকে বলে এবং সাক্ষর সম্পন্ন ব্যক্তির দক্ষতা বলতে পারবেন।
- সাক্ষরতা মাত্রাভেদে দেশের জনমিতিক অবস্থা তুলনা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সাক্ষরতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাতীয় উন্নয়নে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : সাক্ষরতার ধারণা

সাক্ষরতার সর্বজন স্বীকৃত কোন একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সময়ে এবং দেশভেদে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, একসময় কোন চিঠি বা ডকুমেন্ট-এ স্বাক্ষর করার সামর্থকে সাক্ষরতা বলা হত। কিন্তু সাক্ষরতার এ ধারণাটি ছিল অতি সংকীর্ণ। কারণ ব্যক্তি কোন অক্ষরজ্ঞান ছাড়া এবং কোন কিছু না বুঝেও সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে একটা কাগজে স্বাক্ষর করতে পারে। সুতরাং একজন কাগজে সই বা স্বাক্ষর করতে পারলেও প্রকৃত অর্থে সে সাক্ষর নাও হতে পারে।

সাক্ষরতার ধারণার এই সীমাবদ্ধতার কারণে পরবর্তীতে এ ক্ষেত্রে কার্যকরী সাক্ষরতা (functional literacy) প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। এ অর্থে সাক্ষরতা বলতে, 3R's (reading, writing and arithmetic) অর্থাৎ ব্যক্তি বুঝে পড়তে, লিখতে এবং দৈনন্দিন হিসাব করতে পারাকে বোঝায়। সাক্ষরতার পরিধি বর্তমানে আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের যোমতিয়ান-এ অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে সাক্ষরতার এই (3R's) ধারণার সাথে সংযোজিত হয়েছে - গণমাধ্যম, বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক সাক্ষরতা। অর্থাৎ বর্তমানে একজনকে সাক্ষর ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে হলে তাকে পড়া, লেখা ও হিসাব করতে পারার পাশাপাশি ঐসব মাধ্যম থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তা থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অর্থবহভাবে বের করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

পর্ব-খ: জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে এবং জাতীয় উন্নয়নে সাক্ষরতার ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা জানি জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সাক্ষরতা। নিরক্ষরতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্ধারকগুলিকে (জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদি) সব সময়ই অতি উচ্চ মাত্রায় ধরে রাখে। আর তাই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনাই যথাযথভাবে সফল হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষিত পরিবারগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেছে এবং মৃত্যু হারও কমে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিক্ষিতের চাইতে নিরক্ষর জনসংখ্যা অনেক বেশী, তার অর্থ শিক্ষাক্রমে জনসংখ্যা শিক্ষা যত কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন দেশের একটা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর উপর তার কোন প্রভাব নেই। আর সে কারণেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এসব দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আশাব্যঞ্জকভাবে হ্রাস পাচ্ছে না।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। ব্যক্তির পাঁচটি অপরিহার্য মৌলিক উপাদানের মধ্যে এটি অন্যতম। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার পরেই ব্যক্তির যে ন্যূনতম শিক্ষা প্রয়োজন তাই হল সাক্ষরতা। মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে এ সাক্ষরতার প্রয়োজন হয়। এ বিবেচনায় সাক্ষরতা ও ন্যূনতম শিক্ষা সমার্থক। আপনার চিন্তায় সাক্ষরতা মানব জীবনে কী কী কারণে প্রয়োজন তা নিচের ছকে উল্লেখ করুন। প্রয়োজনে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে আপনার চিন্তাকে মিলিয়ে দেখুন।

কাজ-১

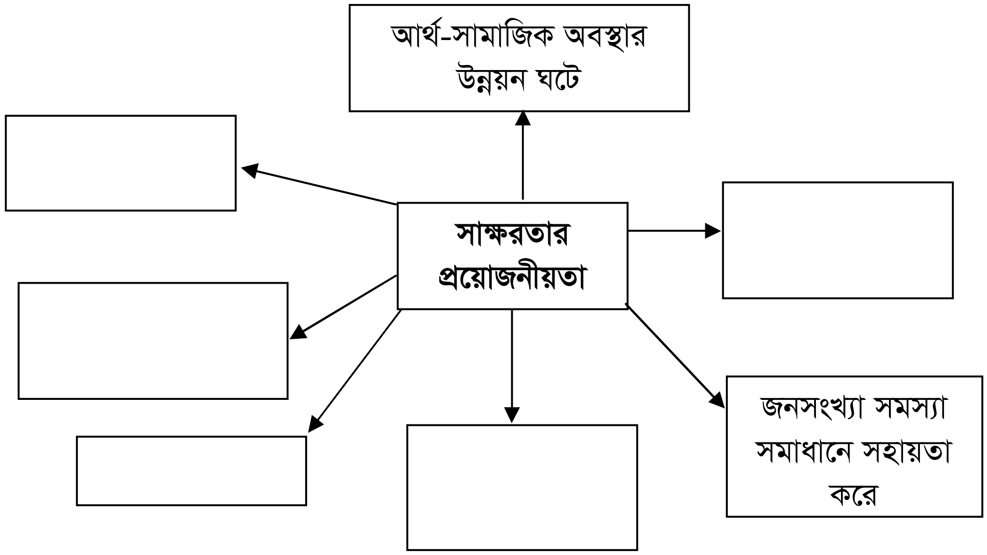
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে
সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা
জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে

পর্ব-গ : সাক্ষরতার হার বাড়াতে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমাদের জাতীয় উন্নযনে সাক্ষরতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনার কি কোন ভূমিকা নেই? আপনি কি পারেন না এতে অংশগ্রহণ করতে? আর আপনি যদি শিক্ষক হন তবে আপনি কি পারেন না আপনার শিক্ষার্থীদের একাজে অংশগ্রহণ করাতে? নিশ্চয়ই পারেন। একটু চিন্তা করুন এবং ভাবুন তারপর নিচের বক্সে লিখুন আপনি কীভাবে আপনার শিক্ষার্থীদেরকে এ কাজে অংশগ্রহণ করাবেন এবং আপনি কীভাবে এ কাজে অংশগ্রহণ করবেন? মনে রাখবেন আপনার ছোট্ট একটু উদ্যোগ দেশকে এগিয়ে নেবার একটি বড় পদক্ষেপ। প্রয়োজনে সম্ভাব্য উত্তর থেকে কিছুটা ধারণা নিতে পারেন।

কাজ-১

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

সাক্ষরতা

সাক্ষরতা

একজন মানুষের মনের ও শরীরের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। দৈনন্দিন জীবনে সকল রকমের প্রয়োজন মেটানো এবং সুন্দর ও সাবলীলভাবে জীবন যাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন হয় তার সবকিছু জানা বা করতে পারাই হলো শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এফআইভিডিবি-এর নির্বাহী পরিচালক আহমেদ বলেন- “শিক্ষার অভীষ্ট শুধু সাক্ষরতা লাভ নয়, সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, সহিষ্ণু, সততাপরায়ণ ও ন্যায়সঙ্গত মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখে”। আর শিক্ষার প্রথম পাঠ হল সাক্ষরতা। খুব সাধারণ অর্থে সাক্ষরতা মানে অক্ষর চিনে পড়তে পারা, লিখতে পারা ও হিসেব-নিকেশ করতে পারা। যাকে ইংরেজীতে বলে 3RS (Reading + Writing + Arithmetic) বিষয়টিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি।

ক) সাক্ষরতা মানে লিখতে পারা পড়তে পারা ও হিসাবনিকাশ করার ক্ষমতা। এক কথায় অক্ষর ব্যবহারের ক্ষমতা। বিষয়টিকে আমরা লিখতে পারি

সাক্ষর= স্ব+অক্ষরঃ নিজ নামের অক্ষর বা শুধু নামসই করতে পারা

সাক্ষর= স+অক্ষরঃ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি

সাক্ষরতা= পড়া+লেখা+হিসাব নিকাশঃ পড়তে পারা, লিখতে পারা ও হিসাব নিকাশ করতে পারার ক্ষমতা।

সাক্ষরতা বিশেষজ্ঞ ম. হাবিবুর রহমান শিক্ষাকোষ-এ (পৃষ্ঠ-৮৩৮) বলেন, ‘‘বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিসরে ‘সাক্ষরতা’ শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে’’ লোক গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে সাক্ষরতা কথাটির উদ্ভব ঘটেছে সাক্ষর শব্দ থেকে।

গণসাক্ষরতা অভিযান এর এডুকেশন ওয়াচ ২০০২ এর প্রতিবেদনে সাক্ষরতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

"সাক্ষরতা হলো পরিচিত বিষয় ও প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পড়তে ও লিখতে পারার দক্ষতা ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখতে দৈনন্দিন জীবনে এ দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা।"

এতদঞ্চলে সাক্ষরতা কর্মকান্ড প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সাক্ষরতার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খলভাবে সাক্ষরতার সংজ্ঞা দেয়া হয় ১৯৫১ সালে। সে থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে সাক্ষরতার সংজ্ঞার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং নতুন নতুন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

১৯৫১: স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন বাক্য পড়তে পারার ক্ষমতা।

১৯৬১: যে বুঝে কোন ভাষা পড়তে পারে সে-ই সাক্ষর।

১৯৭৪: যে কোন ভাষা পড়তে এবং লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর বলে গণ্য করা যায়।

১৯৮১: যে কোন ভাষায় চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতা থাকলে তাকে সাক্ষর বলা যায়।

১৯৮৯: মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করা এবং লিখে রাখার ক্ষমতা।

২০০১: বুঝে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।

দেশের শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের অনেকেই মনে করেন, সাক্ষরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা ও হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে 'কমপক্ষে দেশের প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের (মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার) যোগ্যতা অর্জন করবে এবং দৃশ্যমান সামগ্রী যেমন পোস্টার, চার্ট, ছবি, আলোকচিত্র ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

বাংলাদেশে সাক্ষরতা প্রদানকারী বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (NGO) সম্মিলিত জোট 'গণসাক্ষরতা অভিযান (CAMPE)' কর্তৃক প্রকাশিত এডুকেশন ওয়াচ ২০০২: 'বাংলাদেশে সাক্ষরতা-প্রয়োজন নতুন ভাবনার' রিপোর্টে সাক্ষরতার চারটি স্তরের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা বাংলাদেশে সাক্ষরতা ধারণার বিবর্তনের একটি উদাহরণ।

সাক্ষরতা: পরিচিত বিষয় ও প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পড়তে ও লিখতে পারার দক্ষতা ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখতে দৈনন্দিন জীবনে এই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে না পারা।

অ-সাক্ষর: বর্ণ ও শব্দ পড়তে ও লিখতে না পারা, গণনা করতে না পারা এবং এ কারণে এই দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে না পারা।

প্রাক-সাক্ষর: কিছু শব্দ পড়তে ও লিখতে পারা, নূন্যতম গণনার দক্ষতা অর্জন এবং দৈনন্দিন জীবনে এই দক্ষতাগুলোকে খুবই সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা।

প্রারম্ভিক স্তরে সাক্ষর: পরিচিত বিষয়াবলি সম্পর্কিত সহজ বাক্যসমূহ পড়তে ও লিখতে পারা, পাটিগণিতের চারটি মৌলিক নিয়মে অঙ্ক কষতে পারা এবং প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত পরিবেশে এই দক্ষতা ও যোগ্যতাগুলো সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা।

উচ্চতর স্তরে সাক্ষর: বিচিত্র বিষয়াবলি সম্পর্কিত লেখা সাবলীলভাবে পড়তে পারা, এ ধরনের বিষয়াবলি সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারা, পাটিগণিতের মৌলিক চার নিয়মে দক্ষতা লাভসহ গাণিতিক কার্যকরণ বুঝতে পারা, প্রাত্যহিক জীবনে এই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা এবং অধিকতর শিক্ষা গ্রহণকল্পে সামগ্রিক সাক্ষরতা দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারা।

সাক্ষরতার আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ঃ

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাক্ষরতা সম্পর্কিত উদ্যোগসমূহ, সাক্ষরতা ধারণার বিবর্তন, বিভিন্ন সাক্ষরতা অভিযান ও কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাক্ষরতা ধারণার প্রধান উৎস হচ্ছে ইউনেস্কো। ১৯৯৩ সালে প্রদত্ত ইউনেস্কোর সংজ্ঞানুসারে সাক্ষরতা হচ্ছে, “দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত সাধারণ বক্তব্য বিবৃতি ও পড়তে ও লিখতে পারা।” সংজ্ঞাটি জনপ্রিয় হলেও ক্রমান্বয়ে এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে দেওয়া সংজ্ঞাটি হলো: “যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত সহজ বক্তব্য বুঝে পড়তে ও লিখতে পারে সে-ই সাক্ষর” (ইউনেস্কো, ১৯৯৫)।

সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর UNESCO-র উদ্যোগে বিশ্বব্যাপি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (International Literacy Day) পালন করা হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিতের পর থেকে বাংলাদেশে সাক্ষরতা কার্যক্রম গৃহীত হয়। ১৯৮০ দশকে এ কার্যক্রম জোরদার হয় এবং হাজার হাজার নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা কার্যক্রমের

আওতায় আনা হয়। সাক্ষরতার উদ্দেশ্যগুলো মানুষের কিছু দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো, যে দক্ষতাগুলো না থাকলে মানুষকে সাক্ষর বলা যাবে না। দক্ষতাসমূহ হল নিম্নরূপ :

১। মুখের ভাষা ও লিখিত রূপের মিল বা সংযোগ বুঝতে পারা

২। শব্দ চেনা ও তার অর্থ বুঝতে পারা

৩। রেকর্ড রাখতে ও তার ব্যাখ্যা করতে পারা

৪। নির্দেশনা বুঝতে পারা

৫। হিসাব নিকাশ করতে পারা

৬। মূলভাব খুঁজে বের করতে পারা

৭। সাধারণ যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করা

সাক্ষরতার মান

একজন সাক্ষর ব্যক্তি যে মানের সাক্ষরতা অর্জন করে তাই হলো সাক্ষরতার মান।

সাক্ষরতার মান হলো ঃ

- পড়ার মান
- লেখার মান
- হিসাব নিকাশের মান

(সূত্রঃ বয়স্ক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম)

বাংলাদেশে সাক্ষরতা কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করতে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে :

১) গণশিক্ষা কার্যক্রম

২) সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম

৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

৪) প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ

৫) নানামুখী প্রচারের ব্যবস্থা

বেসরকারি কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (NGO) সাক্ষরতা কার্যক্রমে ভূমিকা রেখেছে। এগুলো হলো :

১) গণ সাহায্য সংস্থা
২) প্রশিকা
৩) প্ল্যান বাংলাদেশ
৪) ব্র্যাক (BRAC)
৫) ঢাকা আহসানিয়া মিশন
৬) স্বনির্ভর বাংলাদেশ
৭) কোরআনিক স্কুল সোসাইটি
৮) পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র
৯) বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি
১০) উন্নয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
১১) টিএসএসএস

খ) সাক্ষরতার মাত্রাভেদে দেশের জনমিতিক অবস্থা (Fisher, 1982)

নিরক্ষরতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্ধারণগুলিকে (জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদি) সব সময়ই অতি উচ্চ মাত্রায় ধরে রাখে। এই অবস্থায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে যদি এভাবেই নিরক্ষর রেখে দেওয়া হয় তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনাই যথাযথ ভাবে সফল হবে না। সুতরাং জাতীয় উন্নয়নের জন্য চাই সাক্ষরতা।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিক্ষিতের চাইতে নিরক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশি, তার অর্থ শিক্ষাক্রমে জনসংখ্যা শিক্ষা যত কার্যকর ভাবেই অন্তর্ভূক্ত করা হোক না দেশের একটা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর উপর তার কোন প্রভাব নেই। আর সে কারণেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এসব দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা আশাব্যাঞ্জকভাবে হ্রাস পাচ্ছে না। শিক্ষার সাথে জনসংখ্যা সমস্যার সম্পর্ক গভীর। কেবল নিরক্ষরতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

বিচার করলে এই সমস্যা আরো ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে পারে মনে করে নিরক্ষরতার সাথে জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখিয়ে এখানে একটি লেখচিত্র উপস্থাপন করা হলো। চিত্র নং- ৬.১ চিত্রে উচ্চ সাক্ষরতা সম্পন্ন (৬৬% এর উর্ধ্বে) ও নিম্ন সাক্ষরতা সম্পন্ন (৩৪% এর নীচে) কতগুলো সেপের মধ্যে স্থুল জন্ম ও মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার এবং সার্বিক প্রজননহার তুলনা করে দেখান হয়েছে। চিত্র থেকে অনুমান করা যায় যে, নিরক্ষরতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্ধারকগুলি থেকে (জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদি) সব সময়ই অতি উচ্চ মাত্রায় ধরে রাখে।

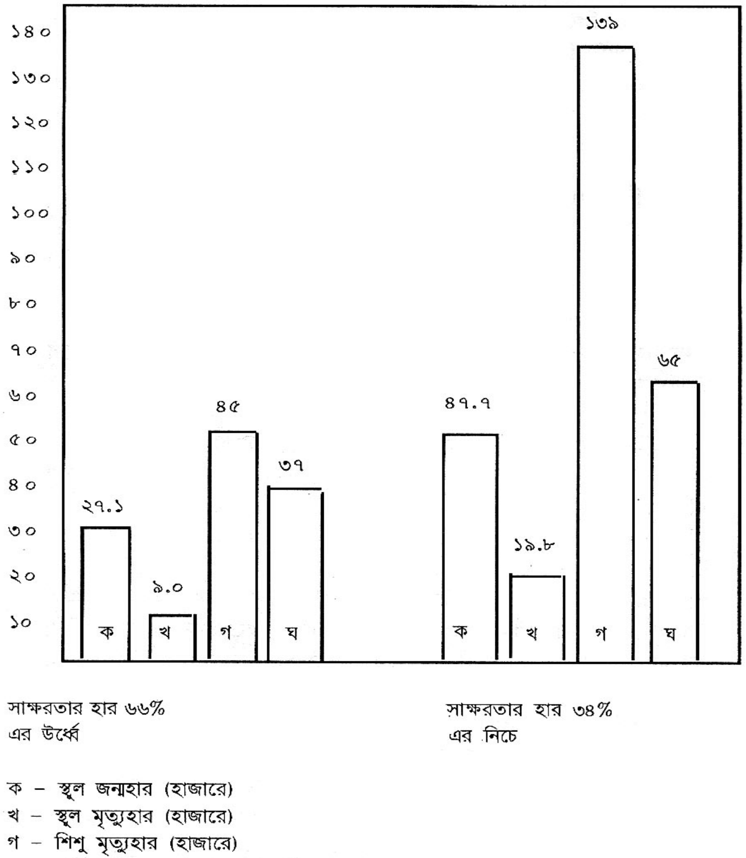

চিত্র- ৬.১

এই অবস্থায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে যদি এভাবেই নিরক্ষর অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনাই সাফল্যমন্ডিত হবে না।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনে সুপ্ত চাহিদার সৃষ্টি করা যায় যা পরবর্তীতে স্বতঃপ্রয়োগিকভাবে কার্যকর হয়। এই সুপ্ত চাহিদা প্রাতিষ্ঠানিক ও পাশাপাশি বিপুলায়তন নিরক্ষরদের মধ্যেও জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই জনসংখ্যা রোধ তথা জাতীয় উন্নয়ন ও জনসাক্ষরতার জন্য চাই সাক্ষরতা।

ব্যবহারিক সাক্ষরতা

জাতীয় উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতার পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। তাই সাক্ষরতার সাথে সাথে প্রয়োজন ব্যবহারিক সাক্ষরতা। সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য বা বিষয়সমূহ জানা এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তা প্রয়োগে উদ্যোগী হওয়াকে ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলা হয়। ব্যবহারিক সাক্ষরতার পাশাপাশি জীবন দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ব্যবহারিক সাক্ষরতার মাধ্যমে মানুষ সাক্ষরতা জীবন দক্ষতার প্রয়োগ কুশলতা অর্জন করে যেমন ডায়রিয়া হলে স্যালাইন খাওয়াতে হয় তা জানে, নিজের প্রয়োজনে তৈরি করে খাওয়ায়, স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য সুখে থাকার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে ইত্যাদি। ব্যবহারিক সাক্ষরতা শোষিত ও নীরব মানুষদের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুখর করে তোলে প্রতিবাদ করতে শেখায়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ শিক্ষা সকলের জন্য প্রয়োজনীয়। ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দেশপ্রেম অর্জন করে এবং অপব্যাখাসমূহ বুঝতে পারে আত্মহত্যা, খুন খারাবিসহ নানা অপকর্মের কুফল বুঝতে পারে।

ব্যবহারিক সাক্ষরতার বৈশিষ্ট্য

ব্যবহারিক সাক্ষরতার বৈশিষ্ট্য হল - এটি উপানুষ্ঠানিক ধারাভুক্ত, স্বল্প সময়ের জন্য পরিচালিত, খরচ কম পেশা ও জীবিকার সাথে সংযুক্ত। এ শিক্ষার বিষয়াদী নির্ধারণ করা হয় শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে। যার যার পেশার উন্নয়নকে সামনে রেখেই এ সকল বিষয় নির্বাচন করা হয়।

সাক্ষরতার গুরুত্ব

দেশের নিরক্ষর গণমানুষকে উৎপাদনমূলক জনসম্পদে রূপান্তর করার মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে সাক্ষরতা তথা শিক্ষা। সাক্ষরতার ফলে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী -

* উন্নয়নের জন্য আত্মসচেতন হবে।

* আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে।

* নিজ লক্ষ্য নির্ধারণে সক্ষম হবে।

* নিজ নিজ পেশায় দক্ষতা অর্জনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

জনশক্তির সৃষ্টিতে বা উন্নয়নে সাক্ষরতার অবদান

* জনমনে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি

* জনগণের চিন্তা ও বিচার শক্তি বিকাশ

* আত্মপ্রচেষ্টায় জ্ঞানার্জন

* সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ জাগ্রতকরণ

* নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ

* কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনক্ষম

* স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন

* জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা

সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচি

এই কর্মসূচির মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬ থেকে ৯ মাসব্যাপী এ কোর্সের মাধ্যমে সাক্ষরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা চর্চার অভাবে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ভুলে যায়। তাই অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতার চর্চা ও তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য গৃহীত হয় সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচি। ৩ থেকে ৬ মাস মেয়াদী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী শিক্ষা বা অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এ কর্মসূচি একজন নব্য সাক্ষরকে পড়ালেখা, হিসাবনিকাশের দক্ষতার পাশাপাশি গণতন্ত্র, নারীপুরষ সমতা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচি ছাড়াও আছে আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন। একই সঙ্গে রয়েছে ঋণ সহায়ক ব্যবস্থা যা তাদের আয়বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এসব প্রশিক্ষণের অর্ন্তভূক্ত হতে পারে :

- সেলাই প্রশিক্ষণ
- হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ
- নার্সারী প্রশিক্ষণ (উদ্ভিদ বিষয়ক)
- গবাদী পশু পালন
- মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ
- ফুল চাষ
- সবজি চাষ
- নার্সারী (চিকিৎসা বিষয়ক)
- শামুক ও ঝিনুকের চাষ
- মৌমাছি চাষ
- ড্রাইভিং
- রেশম পোকার চাষ
- মুক্তার চাষ
- চিংড়ি চাষ

এর ফলে একদিকে নব্যসাক্ষর ব্যক্তির যেমন জীবন মান উন্নয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে সাক্ষরতার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয় তেমনি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হওয়ার প্রয়াস পায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতা ব্যবহারিক সাক্ষরতা ও সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচির সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে। এটা নির্ভর করে মানুষের চাহিদার উপর। প্রতিনিয়তই মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। আজ আমরা যেভাবে সাক্ষরকে সংজ্ঞায়িত করছি এবং সাক্ষরতার দক্ষতা ও মান নির্ধারণ করছি আগামীতে অবশ্যই তার পরিবর্তন ঘটবে।

মূল্যায়নঃ

১. সাক্ষর সম্পন্ন ব্যক্তির দক্ষতা বলতে কী বোঝেন?

২. সাক্ষরতা কীভাবে জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে - ব্যাখ্যা করুন।

৩. জাতীয় সাক্ষরতার উন্নয়নে আপনি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন?

সম্ভাব্য উত্তর:

পর্ব-খ

কাজ-১

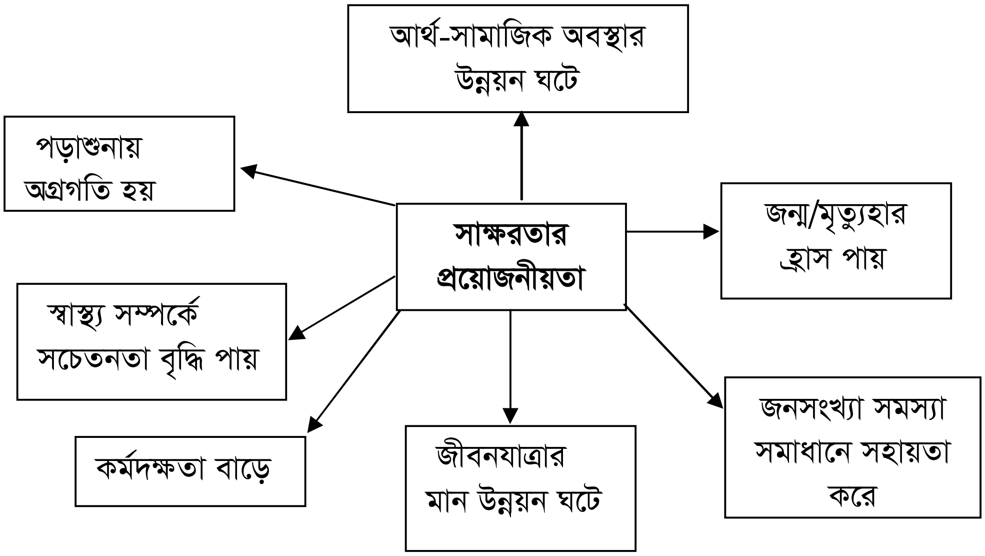
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে
পড়াশুনায় অগ্রগতি হয়
সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা
জন্ম/মৃত্যুহার হ্রাস পায়
স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
কর্মদক্ষতা বাড়ে
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটে
জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে

পর্ব-গ

কাজ-১

- ৭ম / ৮ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় co-curriculum activity হিসাবে প্রতি শিক্ষার্থী একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষরদান করাবে।
- শিক্ষক হিসাবে আপনি আপনার এলাকায় অবসর সময়ে অথবা সন্ধ্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিরক্ষর প্রতিবেশীদের সাক্ষরতায় সহায়তা করতে পারেন।
- শিক্ষক / শিক্ষার্থী সকলেই নিজের ঘরের কাজের মেয়ে অথবা দরিদ্র আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের বিভিন্নভাবে স্বাক্ষরতা দিতে পারেন।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৭**

জাতীয় অর্থনৈতিক নাজুকতা, আর্থিক উৎপাদন ক্ষমতার জন্য আবশ্যক আকাঙ্খা ও দক্ষতা

ভূমিকা

জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন আকাঙ্খা ও দক্ষতা। আবার যে কোন উন্নয়ন আপনা আপনি ঘটে না বা রাতারাতি হয় না। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানব সম্পদের সঙ্গে জাতীয় চাহিদা। অর্থাৎ দক্ষ মানব সম্পদ ও তাদের কার্যক্রম, আর্থিক উন্নয়নের নাজুকতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এ উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উৎপাদনশীলতা, কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক নাজুকতাকে সবল করে উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধিই একমাত্র উপায়। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে যদি একটি দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় সাথে জনসাধারণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে জাতীয় আকাঙ্খা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আর্থিক উৎপাদনশীলতার সমস্যার সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থিক উৎপাদনশীলতা

যে কোন উন্নয়ন ও অগ্রগতির কেন্দ্রে থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর এ অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন

উৎপাদনশীলতা। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দেশের আপামর জনগণের জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে নির্ভরশীল। যে কোন উন্নয়ন ও অগ্রগতির সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রস্টো (Prof. Rostow) মানুষের কতগুলি প্রবণতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো:

- মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের প্রবণতা
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবণতা
- নূতন কৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রবণতা
- বস্তুগত ধারণা অগ্রগতি সাধনের প্রবণতা
- ভোগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতা
- সন্তান লাভের প্রবণতা ইত্যাদি।

অর্থাৎ অধ্যাপক রস্টোর মতে যে কোন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে এ সকল প্রবণতা।

কাজ-১

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, চলুন আমরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি -

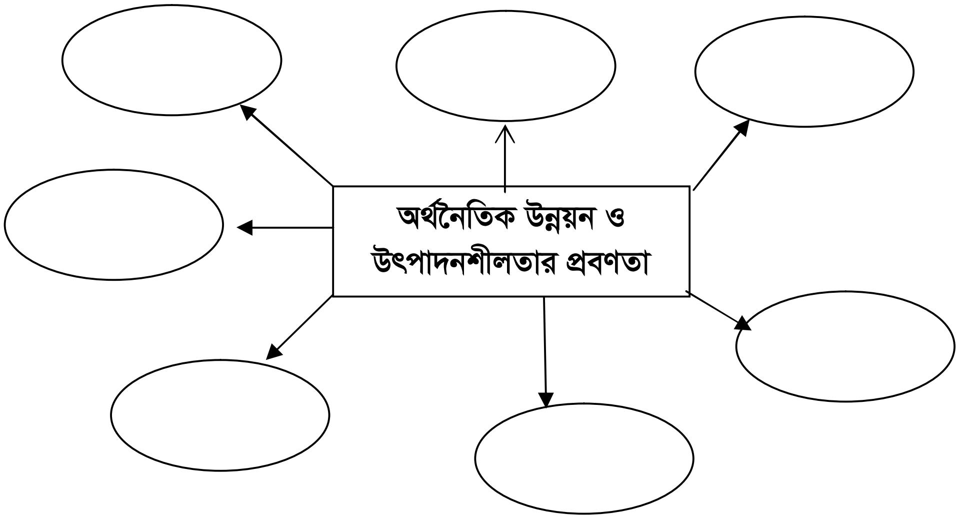

পর্ব-খ : অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতার জন্য জাতীয় আকাঙ্খা ও দৃঢ়তা

জাতীয় উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্রই হচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি। আর এ অগ্রগতির মাধ্যমই হতে হবে উৎপাদনশীলতার প্রতি গভীর আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়ন। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য এবং চাবিকাঠি।

তবে যে কোন উন্নয়ন রাতারাতি বা আপনা-আপনি ঘটে না। যার জন্য চাই জাতীয় আকাঙ্খা, দৃঢ়তা ও দক্ষতা। উন্নয়ন মানুষের জন্য আর তা বাস্তবায়িত হয় মানুষের দ্বারা। উন্নয়নের ফল ভোগ করে মানুষ।

আমাদের দেশের সিংহভাগ জনশক্তি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এ জনশক্তিকে কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায়। দক্ষ মানব সম্পদের সঙ্গে দেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত। আর দক্ষ মানব সম্পদ ও তাদের কার্যক্রম আর্থিক উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এজন্য আবশ্যক জাতীয় আকাঙ্খা ও দক্ষতা। যেমন: শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা ও উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং তার যথাযথ ব্যবহার, কর্মদক্ষতার উন্নয়নে ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণ দান্ উৎপাদিত পন্যের মান ও মূল্য নির্ধারণ, আর্থিক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনিয়ম ও দূর্নীতি দূর করা।

কাজ-১

চলুন আমরা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে জাতীয় আকাঙ্খা ও ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

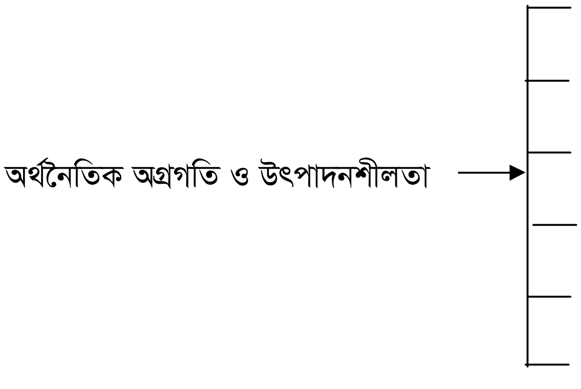

পর্ব-গ : অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থিক উৎপাদনশীলতার সমস্যা সমাধান ও গৃহীত পদক্ষেপ

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি যে কোন দেশের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান বাহক। উন্নয়নে অগ্রগতি করতে সর্বদা তুলনামূলক অগ্রগতির বিষয় বিবেচনায় এনে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ তাই তৃতীয় বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অনুশীলনের মাধ্যমে দেশীয় সম্পদের কথা বিবেচনায় রেখে ক্রমান্বয়ে জাতীয় উন্নয়নে অগ্রসর হতে হবে। বাস্তব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে মানব সম্পদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিকল্পিত উপায়ে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। যেমন:

- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
- শিক্ষার সম্প্রসারণ / পরিমার্জন / পরিবর্ধন
- শিল্পায়ন
- কর্মসংস্থান
- বৈদেশিক বাণিজ্য ভারসাম্য বজায়
- কৃষিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনায় রাখা
- আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা ও ব্যবহার
- জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা
- স্থিতিশীল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- দারিদ্র বিমোচনে বিকল্প চিন্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা
- প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নতকরণ
- সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিতকরণ

- কৃচ্ছতা সাধনে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- মানবসেবাধর্মী বিষয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ
- শ্রমের মর্যাদা ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া
- আগামী প্রজন্মকে আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা প্রদান করা।

কাজ-১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা,

আমরা জাতীয় অগ্রগতিতে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

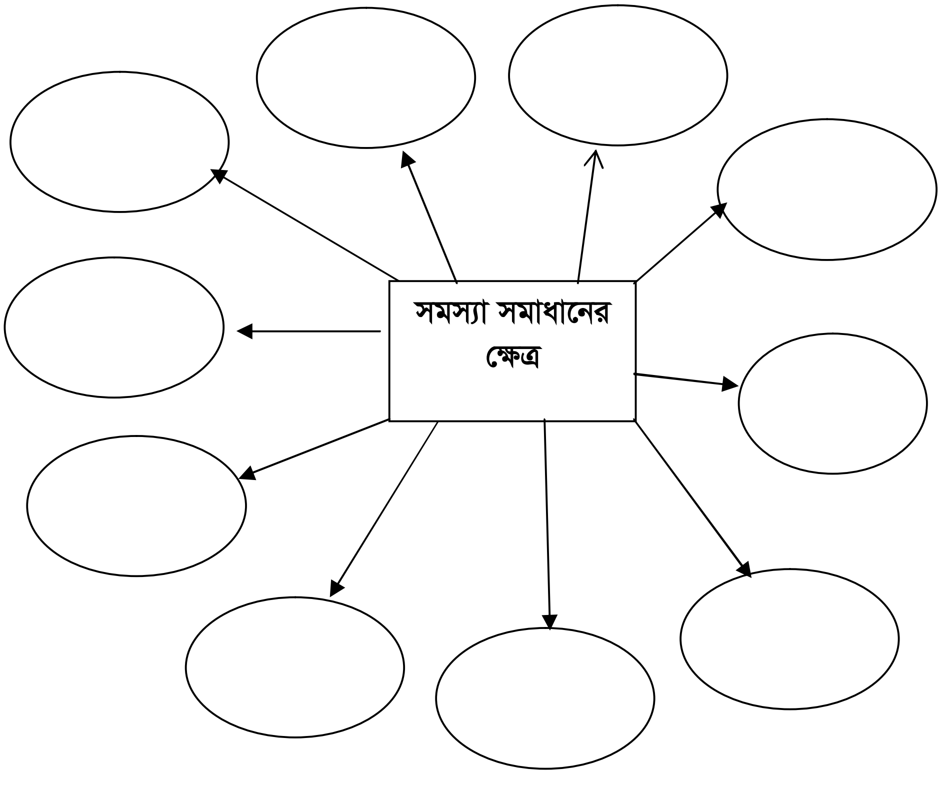

মূল শিখনীয় বিষয়

জাতীয় অর্থনৈতিক নাজুকতা, আর্থিক উৎপাদন ক্ষমতার জন্য আবশ্যক আকাঙ্খা ও দক্ষতা

বিশ্বব্যাপী দ্রুত উন্নয়নের সাথে তাল রেখে বাংলাদেশও দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। যে কোন উন্নয়ন ও অগ্রগতির কেন্দ্রে থাকে অর্থনৈতিক উন্নতি। অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রষ্টো (Prof. Rostow) মানুষের কতগুলি প্রবণতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাখ্যা করেছেন এইগুলি হলো ঃ

১) মৌলিক বিজ্ঞান প্রসারের প্রবণতা।
২) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবণতা।
৩) নূতন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রবণতা।
৪) বস্তুগত অগ্রগতি সাধনের প্রবণতা।
৫) ভোগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতা।
৬) সন্তান লাভের প্রবণতা ইত্যাদি।

অধ্যাপক রষ্টোর মতে এই সকল প্রবণতা সমূহ যে কোন সমাজের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে যার ফলশ্রুতি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উৎপাদনশীলতা কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায় তবেই একে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি একটি দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে জনসাধারণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় তখন একে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

কোন উন্নয়ন আপনা আপনি ঘটে না এবং উন্নয়নের ফল ভোগ করে মানুষ। উন্নয়ন মানুষের জন্য, আবার উন্নয়ন হয় মানুষের দ্বারা। আমাদের দেশের সিংহভাগ মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দক্ষ মানব সম্পদের সঙ্গে দেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত। দক্ষ মানব সম্পদ ও তাদের কার্যক্রম আর্থিক উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আর্থিক অগ্রগতি ও আর্থিক উৎপাদনশীলতার জন্য আবশ্যক জাতীয় আকাঙ্খা ও দক্ষতাগুলো হলো ঃ

১। **শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি ঃ**

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেবল শিক্ষিত জনশক্তি হলেই হবেনা তাকে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। উন্নত দেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় এই সকল দেশে জনশক্তির দক্ষতা বেশি। ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

২। **উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ**

কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ানো এবং তৈরি উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য দরকার আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

৩। **প্রযুক্তি ব্যবহার ও সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণদান ঃ**

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ায় সেজন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পুনঃপুনঃ প্রশিক্ষণ দান করা অত্যন্ত জরুরি।

৪। **উৎপাদিত পণ্যের মান নিরূপণ ঃ**

উৎপাদিত পণ্যের পুনঃপুনঃ মান নিরূপণের মাধ্যমেই পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। যত বেশি পণ্যের মান নিরূপণ করা হবে এতে পণ্যের গুনগতমান তত বৃদ্ধি পাবে।

৫। **উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নির্ধারণ ঃ**

উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত থাকলে জনগণ সঠিক দামে পণ্য ক্রয় করতে পারে তাছাড়া পণ্যের মূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকলে পণ্য বিক্রিও বেশি হবে।

৬। **আর্থিক খাতসমূহের মধ্যে দ্রুত ও সহজ যোগাযোগ স্থাপন ঃ**

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থিক উৎপাদনশীলতার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

৭। আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অনিয়ম ও দূর্নীতি দূর করা ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত অনাচার ও দূর্নীতিমুক্ত রাখতে না পারলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

৮। তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঃ

বর্তমান সময়ে তথ্য ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দ্রুত উন্নয়ন করা সম্ভব। নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও বিদেশের সাথে দ্রুত যোগাযোগ এবং নতুন জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে তা দেশীয় কোন কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব।

৯। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণ ঃ

বর্তমান সময়ে তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষা উন্নত জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়া করবে তারা যেন আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণ করা দরকার।

১০। উন্নত ট্রাফিক সিস্টেম চালুকরণ ঃ

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মালামাল স্থানান্তর দ্রুত করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার নিমিত্তে উন্নত ট্রাফিক সিস্টেম চালুকরণ অত্যন্ত জরুরী।

১১। আর্থিক অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়াবলি মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ঃ

একজন শিক্ষার্থী কীভাবে দেশের আর্থিক অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে সেটা মাধ্যমিক স্তর থেকে জানা দরকার। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে আর্থিক অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

১২। মাধ্যমিক স্তরে হাতে কলমে উৎপাদনশীল শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ ঃ

যে কোন কাজ হাতে কলমে শিখলে সেটা স্থায়ী হয়। কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়, উৎপাদন বাড়িয়ে কীভাবে দেশের উন্নতি করা যায় তা মাধ্যমিক স্তর থেকে জানা দরকার।

১৩। উৎপাদন খাতসমূহ থেকে খেলাপী ঋণ কালচার দূর করা ঃ

বাংলাদেশে যে সমস্ত উৎপাদন খাত আছে সে সমস্ত খাতে উৎপাদন বাড়ানো এবং পণ্যের মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা দরকার। সাথে সাথে প্রদত্ত ঋণ সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কিনা তাও তদারকি করা আবশ্যক। যাতে করে ঋণের সদব্যবহার হয়।

১৪। কলকারখানায় দক্ষ মহিলা নিয়োগ ঃ

কাজের মান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োজনে মহিলা দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, বর্তমানে বাংলাদেশে গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে মহিলারা বেশ দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

১৫। উন্নত কারিগরি জ্ঞান ঃ

উন্নত দেশের শ্রমিকরা উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে। যে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে যত বেশি অগ্রসর সেই দেশ তত বেশি উন্নত। এ জন্য উন্নত দেশের শ্রমিকেরা উচ্চ কারিগরি জ্ঞান ও উন্নত কলাকৌশলের অধিকারী হয়ে থাকে। অতএব বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য দরকার উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

১৬। উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা ঃ

উন্নত দেশ সমূহের উৎপাদন ব্যবস্থাও উন্নত। ফলে এই সকল দেশে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার অধিক হয়ে থাকে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা মাত্র ২০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে জাপানের মত উন্নত দেশে প্রতি একর জমিতে ৬০ মন ধান উৎপন্ন হয়। তাই বাংলাদেশে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা করা দরকার।

১৭। শিক্ষার উচ্চহার ঃ

উন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার উচ্চ হার। অধিকাংশ উন্নত দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি। যেমন-যুক্তরাজ্যে শিক্ষার হার ৯৯ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯৮ শতাংশ, জাপানে ৯৯ শতাংশ, ফ্রান্সে ৯৭ শতাংশ। উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশেও শিক্ষার হার বাড়ানো দরকার ।

১৮। উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

উন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, Transport is civilization অর্থাৎ পরিবহনই হলো সভ্যতা। উন্নত দেশগুলি পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দরকার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থিক উৎপাদনশীলতার

সমস্যার সমাধান এবং গৃহীত পদক্ষেপ

আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ এখনো নিরক্ষর। তাছাড়া প্রতি বছর যেসব শিক্ষার্থী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত হচ্ছে তারাও বেকার, ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও ব্যবহারের মিল নেই। অতএব বাস্তব কর্মক্ষেত্র এবং বিদেশে মানব সম্পদের চাহিদা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য বজায় রেখে পরিকল্পিত উপায়ে জনশক্তি তৈরি করতে হবে। তাছাড়া আরো কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার। সেগুলি হলো ঃ

১। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ

উন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। উন্নত দেশসমূহে স্থায়ী এবং শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।

২। শিল্পায়ন ঃ

কোন দেশের উন্নয়নের জন্য দরকার সে দেশের শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো। যেটা হতে পারে বড়, ছোট ও মাঝারি ধরনের। জাতীয় আয়ের বেশির ভাগই শিক্ষা হতে আসে। যে দেশ যত বেশি শিল্প-সমৃদ্ধ সেই দেশ তত বেশি উন্নত। তাই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে তোলা দরকার।

৩। গুণগত শিক্ষার বিস্তার ঃ

দেশের জনগণকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে শিক্ষা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগে সেই শিক্ষাই দরকার।

৪। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ

দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য বেশি করে কর্মসংস্থানের দরকার। যে শিক্ষা অর্জন করলে দেশে ও বিদেশে কার্মের সংস্থান হবে সেই ধরনের শিক্ষায় যুবসমাজকে শিক্ষিত করা দরকার।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা ঃ

বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্যে সবসময়ই ভারসাম্য রক্ষা করে চলা দরকার।

৬। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ঃ

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত ফসল, কৃষিজাত দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বিধায় কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার।

৭। জনশক্তির পরিকল্পিত ব্যবহার ঃ

উন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দক্ষ জনশক্তি এবং জনশক্তির পরিকল্পিত ব্যবহার। উন্নত দেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় এই সকল দেশে জনশক্তির দক্ষতা বেশি। ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা ও তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। এ সকল কারণে বাংলাদেশেও জনশক্তির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

৮। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ

অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনীতিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। যার দরুন দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি।

৯। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ঃ

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে দরিদ্রতা উন্নতির পথে বড় বাধা। অধ্যাপক মার্কস এর মতে- "একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দরিদ্র" (A country is poor because he is poor), স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ, স্বল্প মূলধন প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা চক্রাকারে ক্রিয়াশীল থেকে দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ রাখে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

১০। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ঃ

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদপ্রথা ও বর্ণ প্রথা প্রভৃতি প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজমান। এই সকল প্রতিকূলতা সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

১১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রাধান্য ঃ

উন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রাধান্য। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য নিজের দেশে উৎপাদন করে এবং বিদেশ থেকে শুধু কাঁচামাল আমদানি করে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত দেশের প্রাধান্য বজায় থাকে এবং বাণিজ্য শর্তও এই সকল দেশের অনুকূলে থাকে। ফলে উন্নয়নশীল দেশ নিজস্বমতে সব কাজ করতে পারে না যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাঁধা সরূপ কাজ করে। অতএব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রাধান্য।

১২। উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

উন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Transport is civilization অর্থাৎ বাংলাদেশেও উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ানো অত্যন্ড়প্রয়োজন।

১৩। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ঃ

উন্নত দেশসমূহ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ তেমনি ঐ সকল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনুন্নত দেশে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উন্নত দেশে প্রচুর মূলধন ও দক্ষ জনশক্তি থাকায় সকল প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

১৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নতকরণ ঃ

উন্নত দেশসমূহের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত পরিমানে বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অবকাঠামো উন্নত করা দরকার।

১৫। উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নতকরণ ঃ

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার।

১৬। কৃষির উপর কম নির্ভরতা ঃ

উন্নত দেশে কৃষিকাজে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম এবং জাতীয় আয়ের ক্ষুদ্রাংশই কৃষি হতে আসে। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা দরকার।

১৭। শিক্ষা বিস্তার ঃ

শিক্ষার অভাবেই মূলত আমাদের জনসংখ্যার মান অত্যন্ত নিম্ন। এই অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও প্রকৌশলগত জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে। একটি বাস্তব ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদের জনসম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১৮। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশের জনসম্পদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষার আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক রুগ্ন ও দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। ফলে আমাদের জনসাধারণের শারীরিক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অত্যন্ত কম। এ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে দেশে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। মিল-কারখানায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১৯। জনগণের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ ঃ

দারিদ্র্যের কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক 'দারিদ্র্য সীমার নীচে' জীবনযাপন করে এবং সুস্থ ও সবল থাকার জন্য যে ন্যুনতম খাদ্যের প্রয়োজন তা আহরণ করতে পারে না। দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি করতে হবে তা হলে জনগণের স্বাস্থ্যগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

২০। পরিবেশ উন্নয়ন ঃ

জনসম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি বহুলাংশে পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত নিম্নমানের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে। দ্রুত জনসংখ্যার চাপে বস্তি এলাকায় বসবাস, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, ময়লা

নিষ্কাশনের অভাব, দূষিত বায়ু সেবন প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়েছে। এই দূষিত পরিবেশ আমাদের জনসংখ্যার গুণগত নিম্নমানের জন্য দায়ী। কাজেই আমাদের জনসম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন করতে হলে উপযুক্ত বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশনসহ আমাদের পারিপার্শ্বিক উন্নতি সাধন করতে হবে।

২১।গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঃ

গ্রাম এলাকার অধিকাংশ লোক দরিদ্র, নিরক্ষর ও আধুনিক সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত। গ্রাম এলাকায় শিক্ষার প্রসার, কৃষির উন্নতি, কুটিরশিল্প স্থাপন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বস্তুত, গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২২।শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঃ

আমাদের দেশে শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতার কারণে তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু এবং কর্মক্ষমতাও কম। শ্রমিকদের গুণগত মান উন্নয়ন করতে হলে তাহাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো দরকার।

২৩। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান আদৌ সম্ভব হয়ে উঠবে না। বস্তুত আমাদের দেশে অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই জনসম্পদের গুণগত মান নিম্ন হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এমতাবস্থায় আমাদের জনসম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন করতে হলে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং সাথে সাথে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সরকার ও জনগণের আন্তরিক সদিচ্ছার।

মূল্যায়নঃ

১. জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা কীভাবে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।

৩. জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

মৌলিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান শিক্ষায় বাস্তব প্রয়োগ, নূতন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রবণতা, ভোগ ও সঞ্চয়ের অগ্রগতির প্রবণতা, সন্তান লাভের প্রবণতা।

পর্ব-খ, কাজ-১

আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থিক উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা বিদ্যমান। দেশের সকল স্তরের জনগণ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থিক উন্নতি চায়। এ লক্ষে উৎপাদনশীলতার জন্য বহূবিধ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন যেগুলিকে আমরা আমাদের আবশ্যকীয় জাতীয় আকাঙ্খা দক্ষতা বলে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন ঃ দক্ষ জনশক্তি, উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থা চালুকরণ, উন্নত কারিগরি জ্ঞান, শিক্ষার উন্নয়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

যেসব সমস্যা দূরীকরণে জাতীয় আকাঙ্খা তা হলো ঃ
অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, শিল্পে অগ্রসরতা, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাতায়াত ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি।

পর্ব-গ, কাজ-১

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রসার, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করা, বেশি করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো ইত্যাদি।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৮**

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

ভূমিকা

জাতীয় চাহিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ। পরিবেশ একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান বাহক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তাই স্বাস্থ্য ও পরিবেশ একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুস্বাস্থ্যের জন্য যেমন চাই সুষম খাদ্য তেমনি পাশাপাশি প্রয়োজন নির্মল পরিবেশ। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে হলে চাই সুস্থ, সবল ও সুন্দর সমৃদ্ধ মনের অধিকারী জনসম্পদ। তাই সুস্থতার জন্য চাই স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রসার। পাশপাশি পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা, সচেতনতা ও সর্বক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সকলকে অবহিত করতে হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- জাতীয় চাহিদার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- সুস্থ, সবল ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উন্নত বিশ্বের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে সর্বাধিক অথচ রয়েছে অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে রয়েছে সঠিক জ্ঞানের ও দক্ষতার অভাব। দারিদ্র, নিরক্ষরতা, কর্মসংস্থানের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশের জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। অন্যদিকে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের ধীরগতির ফলে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে মানুষের স্বাস্থ্যহানী, অপুষ্টি, বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। অতএব, জনসংখ্যার আধিক্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে পুষ্টির সম্পর্কগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করি। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তু থেকে আপনার চিন্তাকে সমৃদ্ধ করুন।

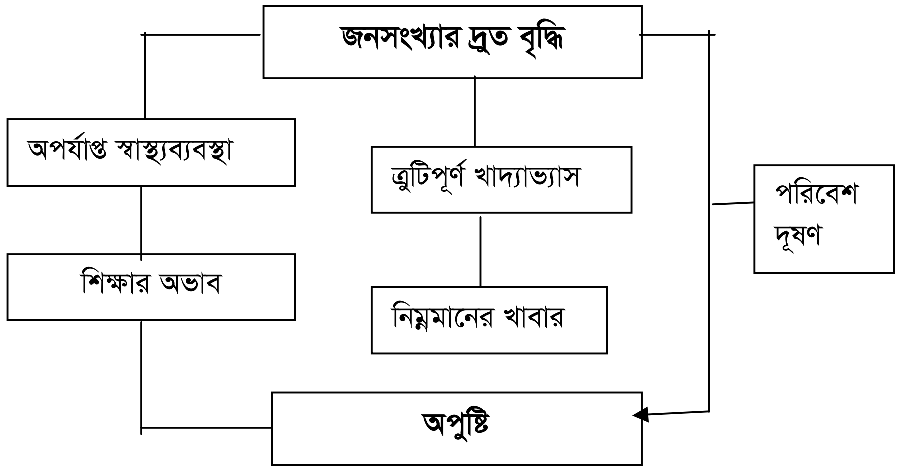

পর্ব-খঃ কোন স্থানে জনসংখ্যার আধিক্য কিভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটায়

পরিবেশের প্রধান উপাদানই প্রাকৃতিক সম্পদ। আর দূষণ বলতে পরিবেশের স্বাভাবিক উপাদান এবং জীব জগতের স্বাভাবিকতা হ্রাসকে বুঝায়। Colin Waker (1971) বলেন "রাসায়নিক, ভৌত অথবা জৈবিক কারণে পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যে কোন পরিবর্তন হল 'দূষণ"। এছাড়া Pollution in its broadest sense is an impairment of the environmental components, natural resources as well as the living world. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ও মারাত্মক পরিবর্তনই হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান রক্ষায় পরিবেশকে বিভিন্নভাবে দূষিত করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে হচ্ছে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধি পরিবেশকে বিভিন্নভাবে দূষিত করে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অভিজ্ঞতার আলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণগুলো চিহ্নিত করুন:

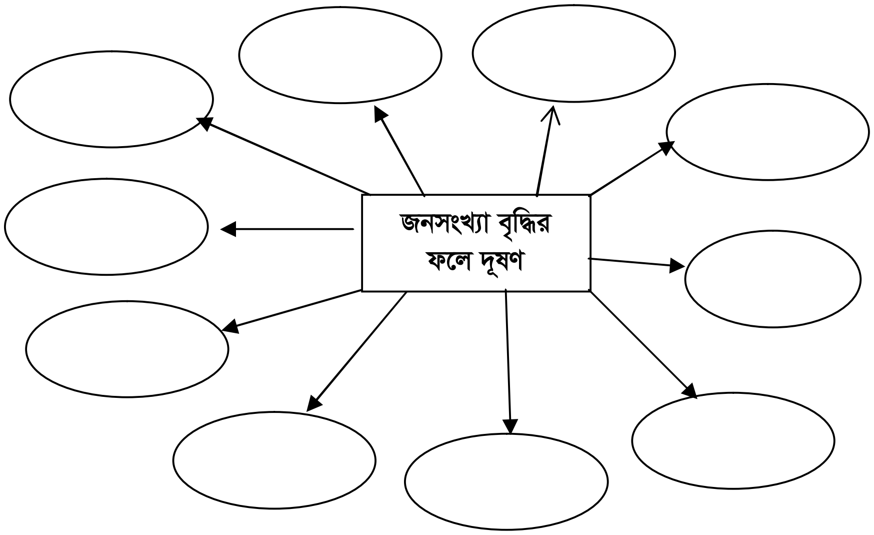

পর্ব-গ : পরিবেশ দূষণ রোধের উপায়

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ দূষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার দূষণ প্রক্রিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা, সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন, গবেষণালব্ধ প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হচ্ছে। কারণ পানি, বাতাস, মাটি, উদ্ভিদরাজিসহ পরিবেশের যে কোন উপাদানের যখন কোন ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনযাপনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তখন সে অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলা যায়। সুতরাং জনসংখ্যার আধিক্যের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ও মারাত্মক পরিণতিই হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। স্থানাভাবের কারণে মানুষের ঘনত্ব বেড়ে মানবসৃষ্ট আচরণিক পরিবর্তনের কারণেই পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। উন্নত জীবন যাপনে মানুষ পরিবেশ নির্ভরশীল কিন্তু সে মানুষই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিভিন্নভাবে পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলছে, সৃষ্টি হচ্ছে নানা প্রকার সমস্যা। আজ বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ বন্যা, খরা, খাদ্যাভাব, সামুদ্রিক ঝড়, সাইক্লোন, বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে

যাওয়া, গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট ইত্যাদি এরই ফল। সুতরাং এ মুহূর্তে পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রতিকার বা রোধ করার লক্ষ্যে সর্বস্তরে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াও এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

কাজ-১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, চলুন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কী কী ধরনের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করি :

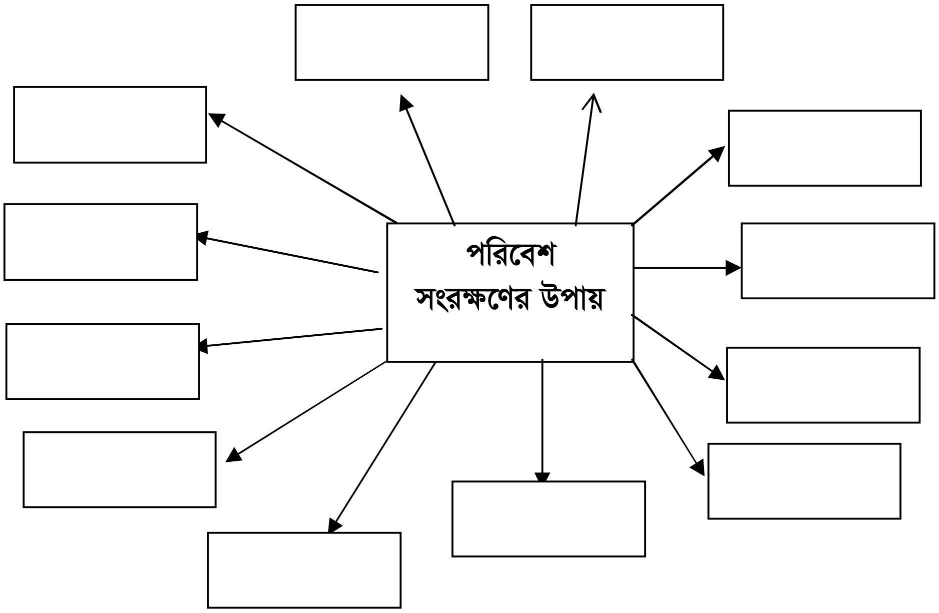

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন নির্মল পরিবেশ। শরীর ভাল রাখার জন্য পরিবেশ দূষণ যেমন বন্ধ করতে হবে তেমনি নির্মল পরিবেশ দ্বারাই পাওয়া যাবে নিরোগ শরীর।

জাতীয় আদর্শ, সমকালীন জীবনের চাহিদার ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে চাই সুস্থ, সবল ও সুন্দর মনের অধিকারী নাগরিক। বলা হয় “সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বাস”। সুস্থ দেহের প্রয়োজনীয়তা ও দেহকে সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও শারীরিক বিকাশ সুস্থ স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জরুরি।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

- ব্যক্তির সুস্থতা
- শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ
- উৎপাদনক্ষম জনশক্তি
- সুস্থ সমাজ
- দূষণমুক্ত পরিবেশ
- সুস্থ সবল জাতি

আধুনিক সমাজে সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলতে হলে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সব করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র শরীর ও মনকে সুস্থ্য রাখা বুঝায় না। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষা মানসিক উৎকর্ষ এবং চারিত্রিক বিকাশ সাধনও করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে স্বাস্থ্য শিক্ষাদান সম্পর্কে বলা হয়েছে- “স্বাস্থ্যহীনতা জাতীয় শক্তি হ্রাস করে”। উপযুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়। জাতীয় অর্থনৈতিক সামর্থ বৃদ্ধি করতে হলে চাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা। স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য দরকার পরিমিত খাবার, দরকার পুষ্টির।

ক) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা অথচ এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রতুল। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, কর্মসংস্থানের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশের জন-জীবন আজ বিপর্যস্ত। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্ত কারণে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে, অপুষ্টিতে ভুগছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, মানুষ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে ভুগছে।

- **নিম্ন অপুষ্টি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুষ্টচক্র দেয়া হল :**

সারণী - ১

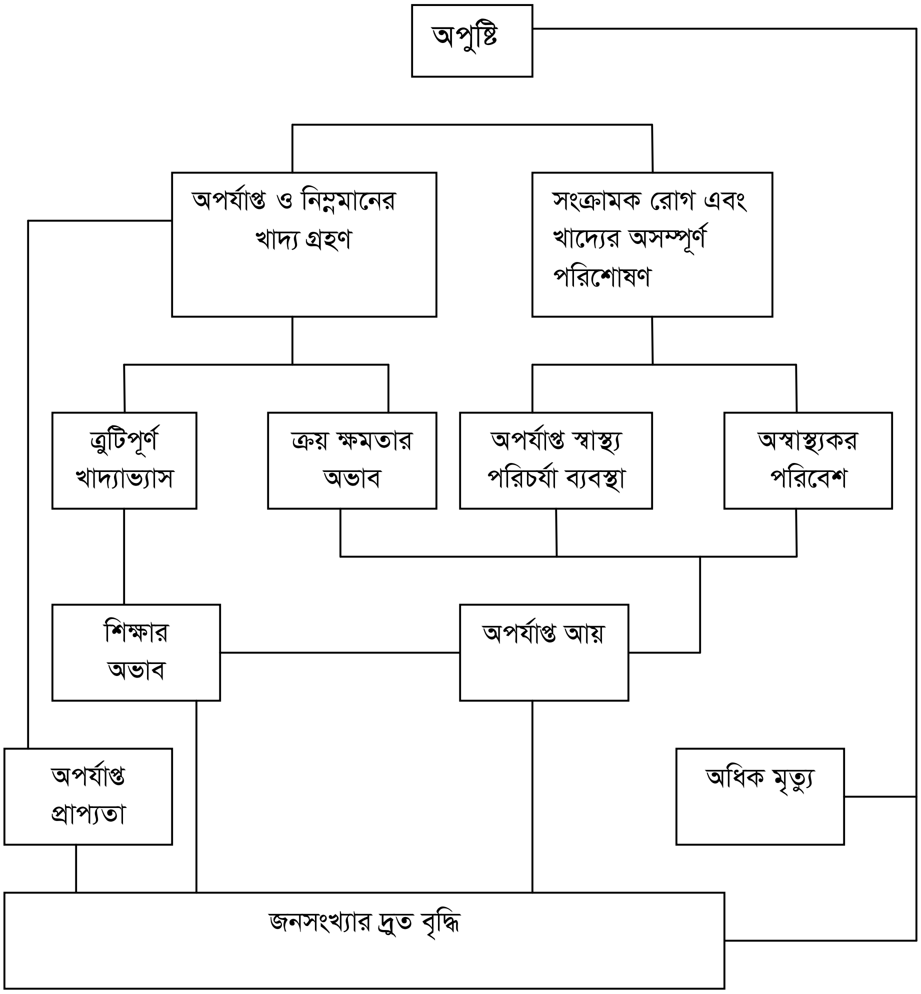
অপুষ্টি
অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ
সংক্রামক রোগ এবং খাদ্যের অসম্পূর্ণ পরিশোষণ
ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস
ক্রয় ক্ষমতার অভাব
অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ
শিক্ষার অভাব
অপর্যাপ্ত আয়
অপর্যাপ্ত প্রাপ্যতা
অধিক মৃত্যু
জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি

চিত্র ৮.১ : অপুষ্টি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুষ্টচক্র

এখানে দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার একটা সম্পর্ক আছে। যার ফলে স্বল্প আয়ের মানুষ অপর্যাপ্ত খাবার এবং নিম্নমানের খাবার খেয়ে থাকে। কারণ দামী ও পুষ্টিকর খাবার থাকে ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তাছাড়া মানুষ বাস করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফলে দেখা দেয় বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও সামাজিক পরিবেশের অবনতির কারণে দেখা দেয় দুরারোগ্য রোগের প্রাদূর্ভাব।

- দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেই কোন সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নাই। বর্তমানে দেশে অনেক হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রস্তুত ও নিয়োগ করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রতি ৭২৩৫ জন ব্যক্তির জন্য মাত্র একজন ডাক্তার এবং ১৬৪৪৪ জনের জন্য মাত্র একজন নার্স রয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এহেন অবস্থায় চিকিৎসকদের কাছ থেকে কতটা সেবা পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া জেলা শহর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি কেবলই জনসর্বস্ব কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ বা উপকরণ এতই অপ্রতুল যে, রোগীর তুলনায় না থাকারই সামিল। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সার্ভিসের অভাবে জনগণের মধ্যে যথার্থ স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে উঠে নাই। ফলে মানুষের মধ্যে রোগ প্রবণতা (morbity) ও মৃত্যুর হার বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে শিশুর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১১০ জন। শিশু মৃত্যু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি বড় অন্তরায়। তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব অঞ্চলে শিশুর মৃত্যুহার বেশি সেখানে প্রজনন হারও উচ্চ।
- অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার সাথে জনসংখ্যার বৃদ্ধির একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। এ দু'টির প্রভাবে মৃত্যুর প্রবণতা বিশেষ করে শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে যায়। যে সমাজে পুষ্টিহীন লোকের সংখ্যা বেশি সে সমাজে মানুষ সব সময়ই বিভিন্ন রকম অনিশ্চয়তায় ভোগে এবং পারিবারিক নিরাপত্তার অভাববোধ করে। নিজেদের শিক্ষার অভাব, প্রয়োজনীয় অর্থাভাব এবং রাষ্ট্রিয় স্বাস্থ্য সার্ভিসের অপর্যাপ্ততার কারণে মানুষ এই ঝুঁকি এড়াবার আর কোন পথ খুঁজে পায় না। তবু তারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের জনশক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা চালায় অর্থাৎ পরিবারের আয় বৃদ্ধির আশায় এবং পারিবারিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে অধিক সন্তান বিশেষ করে ছেলে সন্তান কামনা করতে থাকে। অপরদিকে অধিক

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে গর্ভবর্তী হওয়ার কারণে মায়েদের স্বাস্থ্য অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে এবং প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যু প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বেশি সন্তান জন্ম নেয়ার কারণে মায়ের যেমন অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে তেমনি তার গর্ভজাত সন্তান ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ও রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এভাবেই পুষ্টিহীন সমাজে মৃত্যু বেশি হয় এবং অধিক মৃত্যু মানুষের জন্ম হার বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং সার্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি না হলে দেশের শিক্ষা-জীবন, অর্থনীতি বা স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থার কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য আসবে না তথা মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও ঘটবেনা। উন্নত জীবন মান বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্ত।

পরিবেশ ঃ

মানুষ যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বসবাস করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাই তার পরিবেশ। কোন এলাকার পরিবেশ বলতে ঐ এলাকার ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠানাদি, রাস্তাঘাট, মানুষ, তাদের জীবনযাত্রার মান, কৃষ্টি, আচার-আচরণ সব কিছুকেই বুঝায়।

The Environmental Pollution Control Ordinance of Bangladesh 1977-এ পরিবেশের সংজ্ঞা দেয়া আছে নিম্নোক্তভাবে :

> Environment means the surroundings consist of air, water, soil, food and shelter which can support or influence the growth of life of an individual or group of individuals including all kinds of flora and fauna.

পরিবেশ দুই প্রকার- প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক। আর প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সাংস্কৃতিক পরিবেশ মিলে হয় ভৌগোলিক পরিবেশ। অতএব পরিবেশ বলতে ভৌগোলিক পরিবেশকেই বুঝায়। মানুষ যে এলাকায় বাস করে তার একান্তই নিকটবর্তী এলাকার ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, আবহাওয়া-জলবায়ু মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্তু, ধর্মাচার সবকিছু নিয়েই তার স্থানীয় পরিবেশ।

খ) পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার ঃ

দূষণ বলতে আমরা পরিবেশের উপাদান প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবজগতের স্বাভাবিকতা হ্রাসকেই বুঝি। Colin Waker (1971) বলেন "রাসায়নিক, ভৌত অথবা জৈবিক

কারণে পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যে কোন পরিবর্তনই হল দূষণ”। তাছাড়া দূষণ হলঃ Pollution in its broadest sense is an impairment of the environmental components, natural resources as well as the living world. পানি, বাতাস ও মাটিসহ পরিবেশের কোন উপাদানের যখন কোন ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ত্রিয় পরিবর্তন ঘটে বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তাৎক্ষনিক বা পরবর্তীতে জীবনযাপনের উপর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তখন এই অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ও মারাত্মক পরিণতিই হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। শহর, বন্দর, গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি পরিণাম হচ্ছে স্থানাভাব, স্থানাভাবের কারণে মানুষের ঘনত্ব বেড়ে গেলে সেখানে মানুষের পরিত্যাজ্য ময়লা আবর্জনা জমে চারপাশের বায়ু, মাটি ও পানিকে দূষিত করে তোলে।

- অধিক জনসংখ্যার জন্য অধিক মোটরগাড়ী ও কল কারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকারক ধোঁয়া বায়ুমন্ডলকে ক্রমাগত বিষাক্ত করে স্বাস্থ্যের অনুপযোগী করে ফেলে। তাছাড়াও বিভিন্ন কারণে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে তা হলো যথেচ্ছ বৃক্ষ নিধন, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও উচ্চ শব্দহার, পৌর আবর্জনার নিরাপদ অপসারণের ব্যবস্থার অভাব, পলিথিন ও অনুরূপ ব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহার, ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া, রাস্তাঘাট মেরামতে পিচ গলানো, ধুমপান। এই ধোঁয়ার মধ্যে থাকে বিষাক্ত উপাদান যেমন, সালফার-ডাই- অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। এগুলো মানুষ ও গাছ পালার জন্য অত্যন্ড় ক্ষতিকর। তাছাড়া জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে ফলে বায়ু থেকে অক্সিজেনের মাত্রাও তুলনামুলকভাবে কমে যাচ্ছে। মশা নিধনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক, শহরে অত্যাধিক বস্তির কারণেও পরিবেশ দুষিত হচ্ছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাবার সংস্থান করতে যেয়ে মানুষ জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে অধিক ফসল ফলায় তাতে ফসল বেশি হয় কিন্তু জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। তাছাড়া জমির পোকামাকড় মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। পরে বৃষ্টি বা বন্যা হলে এই সার ও কীটনাশক ঔষধ পুকুর ও নদীনালাতে গিয়ে পড়ে। এতে পানি দূষিত হয়। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে প্রধান প্রধান পানি দূষকগুলো হলোঃ

১। জৈব আবর্জনা

২। জীবাণুসমূহ

৩। উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থসমূহ (শ্বষণ ও প্রশ্বেদন ক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পদার্থ)

৪। কৃত্রিম জৈব পদার্থসমূহ

৫। অজৈব রাসায়নিক পদার্থ

৬। পানিবাহিত পলি ও মাটি

৭। তেজষ্ক্রিয় পদার্থ

৮। উষ্ণ পানি ও

৯। তেল

পানি দূষণ মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য হুমকিস্বরূপ। এতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

মিল কারখানার ত্যাজ্য রাসায়নিক উপাদানগুলো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে পচান সম্ভব নয় সে কারণে এগুলো বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং পরিবেশকে ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। প্রধান প্রধান বায়ু দূষকগুলো হলো ঃ

১। কার্বন ডাই অক্সাইড

২। কার্বন মনোক্সাইড

৩। হাইড্রোজেন সালফাইড

৪। নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ

৫। সালফারের অক্সাইড সমূহ

৬। ভাসমান বস্তুকণা ইত্যাদি।

শহরে ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে মানুষের ত্যাজ্য পদার্থগুলো জৈবিকভাবে পরিবেশকে দূষিত করে তোলে।

● জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দ দূষণও বাড়ছে। অতিরিক্ত যানবাহনের জোরালো হর্ণ, কলকারখানার শব্দ, নির্মাণ কাজের শব্দ, নির্বিচারে লাউডস্পিকারের ব্যবহার, উড়োজাহাজের শব্দ প্রচন্ড কোলাহলের ফলে শব্দ দূষণ হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ দফতর এক জরিপ পরিচালিত করে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজধানী ঢাকায় শব্দের সর্বোচ্চ দূষণ হচ্ছে ৭৫ ডেসিবেল এবং গড়ে ৬৭ ডেসিবেল অথচ বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে

মানুষের জন্য শব্দের সহনীয় মাত্রা হচ্ছে ৪৫ ডেসিবেল। শব্দ দূষণের ফলে রক্তচাপ, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, আলসার, মস্তিষ্কের রোগ, হৃদকম্পন বেড়ে যায়। এমনকি শব্দ দূষণের কারণে গর্ভস্থ সন্তান শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাছাড়া মানসিক রোগীদের একাংশের রোগাক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে শব্দ দূষণ।

ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল থেকে কুঁড়েঘরগুলো রক্ষা করতে পারলেও সুন্দরবনের দুবলারচরের এ গাছগুলোর অবস্থা এখন সঙ্গিন।
(পরিবেশের দারূন অবনতি)
সূত্রঃ প্রথম আলো, ২১/১১/০৭।

- তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণজনিত দূষণ ঃ বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়া, তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণজনিত কারণেও পরিবেশ দূষণের ভীতি বেড়ে গেছে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, চেরনোবিলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং বিভিন্ন দেশে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। চেরনোবিল পারমাণবিক ক্ষেত্রের দূর্ঘটনার পর ইউরোপের ব্যাপক এলাকার কৃষিজাত পণ্য ও দুধ দুষিত হয়ে পড়েছিল ফলে লাখ লাখ টন খাদ্যদ্রব্য তখন নষ্ট করে ফেলতে হয়েছিল। কারণ এতে শিশুদের মানসিক বিকৃতি, বিকলাঙ্গ ও মৃত্যুর ঝুকি ছিল।

আজ বিশ্বব্যাপী যে ভয়াবহ বন্যা, খরা, সামুদ্রিক ঝড়, সাইক্লোন, সম্প্রতি বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে “সিডর” যার ফলে বাংলাদেশের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, এর

একটি বড় কারণ হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষিত হতে হতে আজ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, প্রকৃতিতে সহসাই বিপর্যয় ঘটছে। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে ওজন (O_3) স্তর, বাড়ছে ত্বকের অসুখ এবং সর্বোপরি দেখা দিচ্ছে "গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়া"।

পরিবেশ দূষণের ফলে যে সব প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তা হলো

১. ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। ফলে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দিবে।

২. মানুষ নানা ধরনের নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যহানি ঘটছে।

৩. মানুষের ব্যবহার্য সম্পদ নষ্ট হচ্ছে।

৪. দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

৫. শব্দ দূষণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিপত্তি ঘটতে পারে এবং বিশেষ করে হার্টের রোগী ও গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।

৬. মাটি ও পানি দূষণের ফলে কৃষি কাজে অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে।

৭. বনাঞ্চলের অভাবে বন্য প্রাণী বিলুপ্ত হতে পারে এবং ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির বন্য প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৮. ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চল ও পর্বত শিখরের বরফ গলতে শুরু করবে এবং জলভাগ ও জলভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে :

    ক. বিশ্বের বিভিন্ন নিচু এলাকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হবে।

    খ. উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত দু'কোটি লোক গৃহহারা হবে।

    গ. সুস্বাদু পানির এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যাবে। মিঠা পানি কমে যাবে। ভূ-গর্ভস্থ পানিও লবণাক্ত হবে।

    ঘ. বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি বেড়ে যাবে।

৯. সর্বোপরি শব্দ, মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের ফলে বিশ্ব পরিবেশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হতে পারে।

১০. শিশুদের মানসিক বিকৃতি, বিকলাঙ্গ ও মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে যায়।

পরিবেশকে সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি জরুরি

১. কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিশোষণের ব্যাপারে ব্যবস্থা করা।

২. জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণয়ন করা।

৩. যত্রতত্র কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, ময়লা, আর্বজনা, মলমূত্র, মৃতপ্রাণী ফেলা বন্ধ করা।

৪. পারমাণবিক অস্ত্র, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

৫. ব্যাপকভাবে গাছপালা কর্তন বন্ধের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া।

৬. বন্যপ্রাণী নিধন বন্ধ করে তাদের সংরক্ষণের নিমিত্তে অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা।

৭. রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

৮. বাড়ি-ঘর ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং গৃহস্থালি আবর্জনা নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা।

৯. নালা-নর্দমা পরিষ্কার এবং প্রয়োজনে নদী, পুকুর, খাল খনন করা।

১০. যত্রতত্র ধূমপান বন্ধ করা এবং ধূমপানের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

১১. ভূমি ক্ষয়রোধ, মাটিতে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি, পশু খাদ্যের সংস্থান, মাটিতে জৈব সার বৃদ্ধি, পশুপাখির আবাসস্থল তৈরি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ব্যাপক গাছপালা লাগানো এবং সেগুলো সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা।

১২. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে সম্পদের উপর চাপ কমানো।

১৩. পরিবেশ সংক্রান্ত সামাজিক শিক্ষাক্রম ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং পরিচালনা করা।

১৪. 'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান'-এই নীতি অবলম্বন করা।

১৫. সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিতভাবে দেশের সামগ্রিক ভূমি ব্যবহার পরিবেশ সম্মত করা। পাহাড় কেটে যাতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৬. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার সুনিশ্চিত করা।

১৭. ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিষিদ্ধ করা এবং এ নিষেধাজ্ঞা বাস্ড়বায়নে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া।

১৮. কাঠের বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করা।

১৯. উপকূলীয় বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

২০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা দরকার।

২১. বিশুদ্ধ ও নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

২২. বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালীর ময়লা আবর্জনা নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করা।

২৩. যানবাহনের কালো ধোঁয়া নির্গমন ও উচ্চ শব্দযুক্ত হাইড্রোলিক হর্ণের ব্যবহার রোধ করা।

২৪. পরিবেশ দূষণের কারণ হতে পারে এমন প্রকল্প অনুমোদন থেকে বিরত থাকা।

২৫. প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ করে তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২৬. পরিবেশের বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন দ্রব্য উৎপাদন বন্ধে সকল দেশের সহযোগিতা করা দরকার।

২৭. জাতিসংঘের সনদ অনুসারে সকল রাষ্ট্র তাদের সকল পরিবেশগত বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা।

২৮. যে সব যানবাহন কম দূষণ নির্গমন করে এবং যেগুলোর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নেই, সেগুলোর প্রসার ঘটানো দরকার।

২৯. জ্বালানি সাশ্রয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গ্রাম-গঞ্জে উন্নতমানের চুলা ব্যবহারের অভ্যাস করা।

৩০. গ্রীন হাউজ গ্যাসের (CFC) নির্গমন হ্রাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণে বৃক্ষাচ্ছদন বাড়ানো দরকার।

৩১. সৌর শক্তি ব্যবহার করে এখন সৌর চুলি, হটবক্স, রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়, তাছাড়া সৌর শক্তি দ্বারা পানি বিশুদ্ধকরণও করা যায় যাতে করে পরিবেশ বিশুদ্ধ থাকে। সে ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে বেশি করে প্রচারণা দরকার।

৩২. পরিকল্পিত নগরায়ন ও পরিকল্পিত শিল্পায়ন।

মানুষের বসবাসের জন্য চাই সুস্থ্য, সুন্দর, নির্মল মানবিক পরিবেশ। সে জন্য পরিবেশকে নির্মল ও বিশুদ্ধ রাখার জন্য চাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নিরলস প্রচেষ্টা এবং বাড়তি জনসংখ্যার জন্য আবশ্যক প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সচেতন প্রয়োগ। বন্ধ করতে হবে যুদ্ধ যুদ্ধ

খেলা, বাঁচাতে হবে বন্য প্রাণী, বাড়াতে হবে গাছপালা তাহলেই ভাল থাকবে বর্তমানের মানুষ, বসবাসের উপযোগী ধরণী পাবে আগামী প্রজন্ম।

মূল্যায়নঃ

১. জনসংখ্যার সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২. জনগণকে খাদ্য-পুষ্টির মান সম্পর্কে আপনি কীভাবে সচেতন করে তুলতে পারেন? বর্ণনা করুন।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণে আপনার ভূমিকা আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক, কাজ-১

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, অপর্যাপ্ত নিম্ন মানের খাবার খায়, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভাস, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, খাবারের পুষ্টিমান না জানার জন্যও মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত আছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে আছে শিক্ষার অভাব।

খাদ্যের ৬টি উপাদান: আমিষ, শর্করা, শ্বেতসার, তৈল, খাদ্যপ্রান বা ভিটামিন এবং লবণ। এগুলির একেকটি শরীরের এক এক ধরনের পুষ্টি যোগায়। পরিমিতভাবে যে উপাদান যতটুকু দরকার সে পরিমান খাবার শরীরের পুষ্টি সাধন করে। সব খাদ্যে প্রয়োজনমত সব উপাদান পাওয়া যায় না। যে খাদ্যে যে যে উপাদান যে পরিমান বিদ্যমান ওটাই হচ্ছে ঐ খাদ্যের পুষ্টিমান। এগুলি খাদ্যে প্রাপ্ত ভিটামিন ও ক্যালরির পরিমানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

পর্ব-খ, কাজ-১

পরিবেশ দূষণকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, এবং শব্দ দূষণ। এই সমস্ত দূষণের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। এই সব কিছুর কারণ হচ্ছে - জৈব আবর্জনা, কৃত্রিম জৈব ও অজৈব পদার্থ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, কীটনাশক, পোকা মাকড় নিধন, কালো ধোঁয়া, দূষিত গ্যাসসমূহ, ঘন বসতির কারণে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, গাড়ী-মাইক-কলকারখানার শব্দ ইত্যাদি। আর এর মূলে একটি বড় কারণ হচ্ছে বাড়তি জনসংখ্যা।

পর্ব-গ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৯**

প্রযুক্তির বিকাশ ও বাণিজ্যিকীকরণ

ভূমিকা

প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে প্রচার মাধ্যম বিশ্বকে আজ হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এ গণমাধ্যমসমূহের মধ্যে টেলিভিশন হচ্ছে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উপহার হিসেবে স্যাটেলাইট চ্যানেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ এর দশকে স্যাটেলাইট কর্তৃক সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেলিভিশনের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। এসকল প্রযুক্তির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো দেশ ও বিদেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নত করা এবং স্ব স্ব দেশের ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখা। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিনোদন কার্যক্রমের তুলনামূলক জ্ঞান আহরণ করা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে দেশের মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করা। যার পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ।

D‡Ïk¨

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- প্রচার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ও সম্প্রচার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রযুক্তির বিকাশে কম্পিউটার, তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিক্ষা বিস্ড়ারে প্রযুক্তির বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক: প্রযুক্তির বিকাশ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ও সম্প্রচার কার্যক্রম

প্রযুক্তির আধুনিক বিকাশ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের অবদান অতুলনীয়। প্রাথমিকভাবে স্ব স্ব দেশের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তির বিকাশ হিসেবে স্যাটেলাইট বিভিন্ন দেশের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে প্রভাব বিস্ড়ার করে। টেলিভিশন হয়ে উঠেছে পরম বৈচিত্রপূর্ণ জনপ্রিয় যোগাযোগ, বিনোদন ও শিক্ষার উন্নয়ন মাধ্যম। যার মূল উদ্দেশ্য দেশ ও

বিদেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং শিল্প , সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও বিনোদনের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করা।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন আমরা প্রযুক্তি বিকাশ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের ভূমিকাগুলো চিহ্নিত করি।

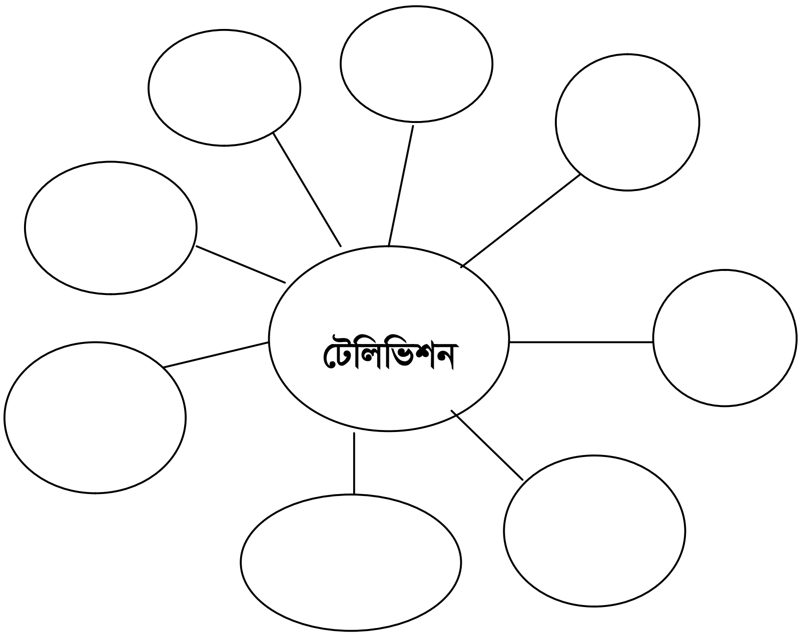

পর্ব-খঃ কম্পিউটার, তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের ব্যবহার

বর্তমান বিশ্বে একটি আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে কম্পিউটার। যে কোন রকম তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ভাষাভিত্তিক যে কোন কাজ, শিখনের ক্ষেত্র হিসেবে, গাণিতিক হিসাব নিকাশ, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, পরীক্ষায়, বিনোদনমূলক সম্প্রসারণে কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যে কোন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনায় কম্পিউটার কাজ করে আসছে। যার ফলে তথ্য বিজ্ঞানের বিপ্লব ঘটছে প্রতিনিয়ত। উন্নত হচ্ছে জীবনের মান। তথ্য প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মের গতি ও ত্রুটিহীনতায় দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে পারে। সাধারণভাবে তথ্য প্রযুক্তি বলতে তথ্য সংরক্ষণ-প্রক্রিয়াকরণ এবং একে বিতরণ ও ব্যবহার করার প্রযুক্তিকে বুঝায়। এ তথ্য প্রযুক্তির তিনটি বিভাগ রয়েছে। যেমনঃ টার্মিনাল, ক্যারিয়ার ও সফট্‌ওয়্যার। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক বিস্ময় সৃষ্টিকারী মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট এখন বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র। যা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা

অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করে। যাকে কম্পিউটার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক (Computer Communication Network) বলা হয়। বর্তমানে Communication Satelite এবং Submarine Cables-কে ইন্টারনেট যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যা মুহূর্তেই তথ্য আদান প্রদান, টেলিকনফারেন্সিং, ই-মেইল, ইন্টরনেট, ফ্যাক্স, বিশ্বের যে কোন স্থানে কথা বলার সুযোগ এনে দিয়েছে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন প্রযুক্তির বিকাশে কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করি।

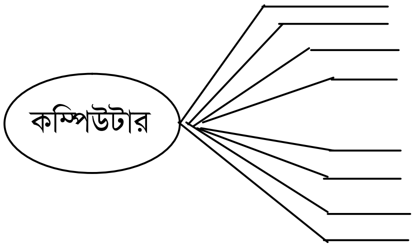

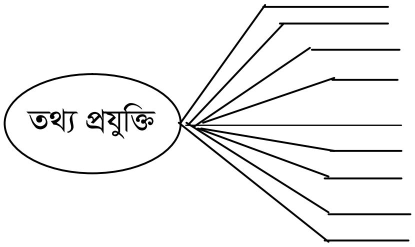

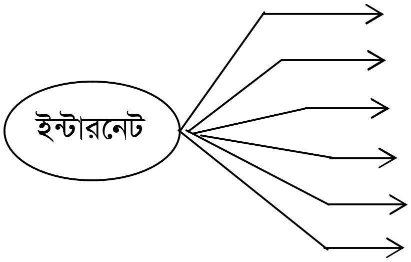

পর্ব-গঃ শিক্ষা বিস্তারে প্রযুক্তির বিকাশ

প্রযুক্তি বলতে সাধারণত আমরা বুঝি কিছু যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার বা স্বয়ংক্রিয় কোন ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তি শুধু যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার বা জটিল কোন মাধ্যম নয় বরং এটি পরিকল্পিত রীতিবদ্ধ কর্মপন্থা বিশেষ। শিক্ষা প্রযুক্তিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি - (১) হার্ডওয়্যার এবং (২) সফটওয়্যার।

হার্ডওয়্যার-এর মধ্যে আছে রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র, প্রজেক্টর ইত্যাদি। আর সফটওয়্যারের মধ্যে আছে ইন্টারনেট, সিডি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন এবার আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারগুলো উল্লেখ করি।

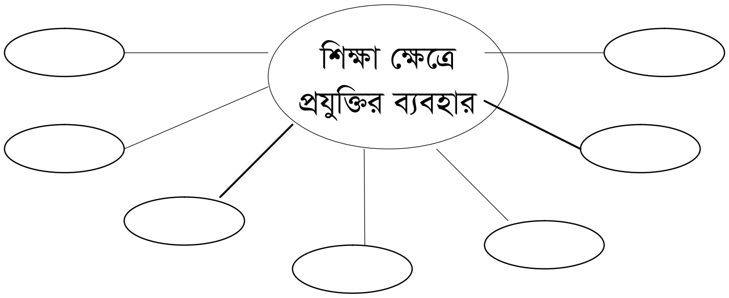

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রযুক্তির বিকাশ ও বাণিজ্যিকীকরণ

টেলিভিশন

আধুনিককালের গণমাধ্যমসমূহের মধ্যে টেলিভিশন হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ১৯৮০ এর দশকে স্যাটেলাইট চ্যানেলে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেলিভিশনের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। স্যাটেলাইট এবং কেবল এর সুবাদে টেলিভিশন দর্শকরা ঘরে বসে দেশ বিদেশের প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা দেখতে ও উপভোগ করতে পারছে। বাংলাদেশে বর্তমান একটি সরকারি ও ১০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল চালু রয়েছে। যেমন: বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং এনটিভি, চ্যানেল আই, এটিএন, বাংলাভিশন, আরটিভি, ইটিভি, চ্যানেল ওয়ান, বৈশাখী, ইসলামিক টিভি ও দিগন্ত টিভি। বাংলাদেশ থেকেও দেখা যায় অন্যান্য দেশের অসংখ্য টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, এইচ.বি.ও, স্টার মুভিজ, স্টার প্লাস, স্টার ওয়ার্ল্ড, ডিসকভারি, স্টার স্পোর্টস, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ইত্যাদি। টেলিভিশন এখন হয়ে উঠেছে পরম বৈচিত্রপূর্ণ জনপ্রিয় যোগাযোগ, বিনোদন ও শিক্ষার মাধ্যম। টিভি চ্যানেল গুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য হলো অনুষ্ঠান প্রাচারের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে বাংলাদেশের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখা। সেই সাথে বাইরের অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিনোদন কার্যক্রমের সাথে দেশের মানুষের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া।

বিনোদনের মাধ্যম ঃ

চিত্ত বিনোদনের উপযোগী আমোদ-প্রমোদের বিচিত্র উপাদান টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। নাচ, গান, নাটক, অভিনয়, চলচ্চিত্র, বিনোদনমূলক নানাবিধ অনুষ্ঠান দর্শক শ্রোতারা প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায়।

সংবাদ প্রচারের মাধ্যম

বিশ্বের সমুদয় সংবাদ, ছোট বড় ঘটনাবলি টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষের গোচরীভূত হয়। মানুষকে খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে- ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী, সর্বাধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে

অবহিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে মানুষ এই টেলিভিশন থেকে। মানুষের সংবাদ সংগ্রহের এই অনবদ্য মাধ্যমটি দেশের সাধারণ মানুষকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করছে। এমনকি নিরক্ষর মানুষকেও সচেতন করে তুলেছে টেলিভিশন। বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব, সমিতি, সরকারি ও বেসরকারি প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে টেলিভিশন আজ দেশবাসীকে আধুনিক জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছে।

শিক্ষার মাধ্যম

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে টেলিভিশনের ভূমিকা এখন জাতীয় জীবনের অগ্রগতির জন্য একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমন আমাদের দেশের ভয়াবহ নিরক্ষরতা সমস্যা দূরীকরণের কার্যকর উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, তেমনি দূরশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশবাসীকে অধিকতর যোগ্য করে তোলার দুর্লভ সুযোগ দান করা হচ্ছে। টেলিভিশন শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবার জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। খুব সহজে জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ বিচরণ করার সুযোগ দান করছে টেলিভিশন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে টেলিভিশন দেশের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নানা বিষয়ের কোর্স টিভি পর্দায় উপস্থাপিত হচ্ছে।

অন্যান্য

টেলিভিশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার কেবল বিনোদন, সংবাদ এবং শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য কল্যাণধর্মী বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে রয়েছে। যেমন টেলিভিশন ঃ

- দেশের প্রশাসনিক বিষয় সম্পর্কে জনগণকে প্রতিনিয়ত অবহিত করছে।
- ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ প্রচার করছে।
- নতুন পণ্য বজারজাত করার লক্ষ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে।
- প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করছে।
- জনমত সৃষ্টি, জনমত সমন্বয় আর জনসংযোগের উপায় হিসেবে কাজ করেছে।
- সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে জনগণের পরিচয় ঘটাচ্ছে।
- বিশ্বের মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে ভূমিকা রাখছে।
- বিশ্বের সংস্কৃতির পরিচিতি তুলে ধরছে।
- ক্রীড়াজগৎ উপভোগ করার সুযোগ দিচ্ছে।
- নিজের দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা দিচ্ছে।
- দুর্যোগ পূর্ব ও দুযোগ উত্তর কালে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও করণীয় ব্যাপারে ভূমিকা রাখছে।

অর্থাৎ দেশ ও বিশ্বের মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে টেলিভিশন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সংগীত

সংগীত শুধু বিনোদন নয়, শিক্ষার নানা বিষয় লুকিয়ে রয়েছে সংগীতে। আমাদের দেশে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নানা ধরনের সংগীত প্রচার করা হচ্ছে। পল-ীগীতি, ভাওয়াইয়া, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, দেশাত্মবোধক গান ছাড়াও প্রচারিত হচ্ছে জারী, সারী, ভক্তিমূলক গান, আঞ্চলিক গান, আধ্যাত্মিক গান, পালা পার্বনের গান ও উন্নয়নমূলক নানা ধরনের গান (যেমনঃ গম্ভীরা)।

প্রচার বিশ্বায়ন

বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপের জন্য দৈনিক পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশন হতে খবর ও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এর জন্য পত্রিকায় নির্দিষ্ট স্থান ও রেডিও ও টেলিভিশনে সাপ্তাহিক সময় বরাদ্দ থাকে। টার্গেট গ্রুপের মধ্যে রয়েছে কৃষি নির্ভর জনগণ, মহিলা, শিশু, গ্রামীণ জনগণ, শ্রমিক, সেনাবাহিনী, উপজাতি, যুবক বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী ইত্যাদি। স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সারা বিশ্ব উপভোগ করে। টেলিভিশনে বাংলাদেশের প্রচারিত শতকরা আশিভাগ অনুষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব সুসজ্জিত ও সুবৃহৎ স্টুডিওতে অথবা বহিরাঙ্গনে তৈরি। আমদানীকৃত অনুষ্ঠানের পরিমাণ শতকরা ত্রিশ ভাগেরও কম। উপগ্রহের মাধ্যমে আন্ড়র্জাতিক সংবাদভিত্তিক ছবির জন্য ইউরোভিশন ও এশিয়াভিশনের সাথে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চুক্তি রয়েছে। স্যাটেলাইট এবং কেবলের সুবাদে টেলিভিশন দর্শকরা নিজের ঘরে বসেই যেমন দেশের বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানমালা দেখতে পারছে তেমনি বিদেশের টিভি চ্যানেলে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানও উপভোগ করছে।

শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রচার মাধ্যম

শিখন শেখানো কাজে মাধ্যমিক স্ড়রের শিক্ষার্থীদের উপযোগী নানা ধরনের খবর ও অনুষ্ঠান পত্রপত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশন হতে প্রচারিত হয়। শুধুমাত্র বিনোদন হিসেবে নয়,

জীবনের নানা সমস্যা সমাধানেও এসব তথ্য ও অনুষ্ঠান তাদের কাজে আসে। যেমন তাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের মধ্যে রয়েছে :

- ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা
- মাদক দ্রব্যের কুফল ও মাদকাশক্তির প্রভাব
- নারী নির্যাতন ও নারী পাচার প্রতিরোধ
- চোরা চালান প্রতিরোধ
- দেশীয় পণ্যের ব্যবহার
- আর্থ- সামাজিক ও পল্লী উন্নয়ন
- ভূমি সংস্কার
- সমবায় ও স্বনির্ভর কর্মসূচি
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণ তৎপরতা
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- কৃষি, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুষ্ঠান
- ক্রীড়া অনুষ্ঠান
- পরিবেশ সচেতনতা ইত্যদি।

টেলিভিশন আধুনিক জনজীবনের নিত্যসঙ্গী। সর্বাধুনিক তথ্য আর সংস্কৃতির বাহন আর বিচিত্র জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সহায়ক। তবে টেলিভিশনকে মানুষের কল্যাণকর কাজে সীমাবদ্ধ রাখা অপরিহার্য। এর মাধ্যমে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্বেষ প্রচারণার সুযোগ রয়েছে, আছে কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি প্রচারের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের পথ সহজ করে দেয়া। বিদেশী ছায়াছবির আপত্তিকর বিষয় এনে তরুণদের বিভ্রান্ত করার আশঙ্কা প্রবল। উপগ্রহের মাধ্যমে অসংখ্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে যেসব বিভ্রান্ডি়কর সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে সচেতন হতে হবে। টেলিভিশনকে কল্যাণকর বিষয়ে কাজে লাগাতে হবে। এর সাহায্যে আধুনিক জীবনধারাকে সুন্দর করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে গড়ে তুলতে হবে সম্প্রীতির নিবিড় বন্ধন।

কম্পিউটার

বর্তমান বিশ্বে অদ্বিতীয় আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে কম্পিউটার। ব্যাংক. বীমা, অফিস-আদালতের হিসাব নিকাশ পরিচালনা ও সংরক্ষন করা, ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরীক্ষণ ও কার্যক্রম পরিচালনা, যে কোন রকম তথ্য সংরক্ষণ, ভাষাভিত্তিক যে কোন

কাজ, মুদ্রন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায়, গাণিতিক বড় বড় হিসাব নিকাশ করা, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যেমন- নাচ, গান, খেলা ইত্যাদি সমস্ত কাজ কম্পিউটারে করা হচ্ছে।

এ ছাড়া ছোট বড় মিল, কলকারখানা, যানবাহন, যুদ্ধাস্ত্র, রেডিও , টেলিভিশন ইত্যাদি কম্পিউটার দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। রোবটের দ্বরা যে দুঃসাধ্য কাজ করা হচ্ছে তার মূলেও কম্পিউটার।

কম্পিউটার এখন মানুষের মস্তিষ্কশক্তি সবল করছে এবং তথ্য বিজ্ঞানের বিপ্লব ঘটাচ্ছে। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং সরকারের প্রশাসনিক পদ্ধতিতে কম্পিউটার ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারে। ফলে জীবনের মান উন্নয়ন সম্ভব। কম্পিউটার শক্তিশালী এবং বৈপ্লবিক ব্যবস্থাপনার সহায়ক। তথ্য প্রযুক্তি যথার্থ এবং সময়োচিত প্রয়োগ গতি ও ত্রুটিহীনতা বাড়িয়ে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কম্পিউটার ডিক্স বা সি.ডি.

কম্পিউটারে অন্তর্ভূক্ত করা তথ্যাদি কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক এ সংরক্ষিত থাকে। হার্ড ডিস্কের আয়তন বা ধারণ ক্ষমতার সীমা আছে। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক থেকে সংরক্ষিত তথ্য কম্পিউটার ডিক্স বা সি.ডি. তে তুলে রাখা যায়। এটা তথ্য সংরক্ষণের একটি পৃথক ব্যবস্থা। কম্পিউটারের মাধ্যমে এক সি.ডি. থেকে অন্য সি.ডিতে অনুলিপি (Copy) করা যায়। সি.ডিতে করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। এভাবে অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করা যায় সি.ডি.র মাধ্যমে। সি.ডি.র মত আর এক ধরনের ব্যবস্থা আছে- পেন ড্রাইভ। পেন ড্রাইভ আকারে ছোট ও এর ধারণ ক্ষমতা বেশি বিধায় ব্যবহারের সুবিধা সি.ডির চেয়ে বেশি।

তথ্য প্রযুক্তি

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। সাধারণভাবে তথ্য প্রযুক্তি বলতে তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, এবং একে বিতরণ ও ব্যবহার করার প্রযুক্তিকে বুঝায়। একে Information Technology বা IT নামে অভিহিত করা হয়। টেলিযোগাযোগ, উপগ্রহ যোগাযোগ, অডিও ভিডিও সম্প্রচার, ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, নেটওয়ার্কিং, প্রাকৃতিক

সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপাত্ত প্রয়োগ, মুদ্রন ও রিপ্রগ্রাফিক প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, তথ্য ভান্ড প্রযুক্তি সবগুলোকে মিলিয়ে তথ্য প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। তবে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই তথ্য প্রযুক্তির ব্যপকতা লাভ করেছে। সঠিকভাবে বলতে গেলে কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ডিজিটাল পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে প্রযুক্তিসমূহ একত্রিত হয়ে একটি বিশাল তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে পরিণত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি তিনটি বিভাগ রয়েছে ।

- **টার্মিনাল ঃ** টেলিফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ভিসিআর ইত্যাদি।
- **বাহক বা ক্যারিয়ার ঃ** অপটিক্যাল ফাইবার, কৃত্রিম উপগ্রহ, মাইক্রোওয়েভ।
- **সফ্‌টওয়্যার ঃ** অডিও, ভিডিও, টেক্সট এবং গ্রাফিক্স।

তথ্য প্রযুক্তি শব্দটি আমাদের দেশে কম্পিউটারায়নকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটারাইজেশন (^Computerization) শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়।

বর্তমান জগতে তথ্যই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাইরের পরিবর্তনশীল জগতের সাথে কোন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- কম্পিউটার হলো তথ্য প্রযুক্তির স্নায়ু কেন্দ্র। তথ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনায় একটি জাতির অর্থনৈতিক রূপরেখা পাল্টে যেতে পারে।
- কাঙ্খিত উন্নতির জন্য তথ্য বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন বাংলাদেশে লোক বেশি, জমি কম। তথ্যের সঠিক প্রয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জমির দক্ষ ব্যবহার করা সম্ভব।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সৃষ্ট চাহিদা সমাজে প্রভাব ফেলে। উন্নততর জীবন ধারণ এবং জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সমাজে অসংখ্য পণ্য ও সেবার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি মানুষকে পণ্য বা সেবা গ্রহণে দক্ষ করে তুলতে পারে। সমাজে ন্যাযবিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যাপারে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যাবলি জানা থাকলেই সমাজের প্রতি অঙ্গীকার সঠিকভাবে পালন করা সম্ভবপর হবে। প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় তথ্য এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বে প্রচার মাধ্যম, টেলিযোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল (interactive) হবার ফলে আজ আমরা বিশ্ব নাগরিক।

ইন্টারনেট

তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে ব্যপক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে ইন্টারনেট। এটি ইতোমধ্যে গোটা পৃথিবীকে একটি বড় গ্রামে (global village) রূপান্তরিত করেছে। ইন্টারনেট এখন বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির প্রান কেন্দ্র। ইন্টারনেট হলো তথ্যের মহাসমুদ্র।

ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা। বেশ কিছু কম্পিউটারকে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে জুড়ে দিয়ে তৈরি হয় একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। দুই বা ততোধিক কম্পিউটার এবং কম্পিউটার জাতীয় যন্ত্রপাতি যেমন প্রিন্টার, ডিস্ক ড্রাইভ, প্লটার ইত্যাদি একটি সম্মত নিয়ম অনুযায়ী পরস্পর পরস্পরের সাথে একটি সাধারণ মাধ্যম দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন ও ডাটা প্রেরণ বা গ্রহণের যে ব্যবস্থা তাকে বলা হয় কম্পিউটার যোগাযোগের নেটওয়ার্ক (Computer communication network)। স্কুল কলেজের ছোট পরিসরে, জনবহুল কোন ব্যাস্ড় শহর জুড়ে কিংবা তার চাইতেও বড় বড় কোন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এই নেটওয়ার্কগুলোই হলো ইন্টারনেটের প্রানবিন্দু। তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির এই কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলো আবার যে বিশাল নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করে, সেই বিশাল নেটওয়ার্ককেই বলে ইন্টারনেট (Internet)। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার (Server) মিলে গঠন করেছে ইন্টারনেটের Backbone বা কেদ্রীয় কাঠামো। এই ব্যাকবোনের প্রতিটি কম্পিউটার আবার অসংখ্য কম্পিউটারের সাথে যুক্ত। এভাবেই অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ইন্টারনেট সিস্টেম। অর্থাৎ ইন্টারনেট হলো কম্পিউটার জাল।

Communication Satelite এবং Submarine cables কে ইন্টারনেট যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। বিশ্বের

কম্পিউটারগুলো আজ একে অন্যের সাথে এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। মূহুর্তেই তথ্য আদান প্রদান, টেলিকনফারেন্সিং, ই-মেইল, ইন্টারনেট ফ্যাক্স, কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্বে যে কোন স্থানে কথা বলার সুযোগও এতে স্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষা প্রযুক্তির অর্থ

সাধারণ অর্থে প্রযুক্তি বলতে আমরা বুঝি কিছু যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার বা স্বয়ংক্রিয় কোন ব্যবস্থা। উন্নত দেশে শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা প্রযুক্তিকে মনে করতেন শিক্ষার কাজে যন্ত্রের ব্যবহার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তি শুধু যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার বা জটিল কোন মাধ্যম নয় বরং এটি পরিকল্পিত রীতিবদ্ধ কর্মপন্থা বিশেষ।

Commission on instructional technology শিক্ষা প্রযুক্তিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন "শিক্ষা প্রযুক্তি হলো যোগাযোগ বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সেই মিডিয়া যা শিক্ষক, পাঠ্য বই ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীর পাশাপাশি শিক্ষাদান কাজে ব্যবহৃত হয়"।

শিক্ষা প্রযুক্তি দুই ভাগে বিভক্ত - হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার।

হার্ডওয়্যার ঃ শিক্ষাদান কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও শিক্ষা উপকরণ এগুলি হলো হার্ডওয়্যার। যেমন - রেডিও, টিভি, চলচিত্র, টেপরেকর্ডার, প্রজেক্টর, মুদ্রনযন্ত্র, চকবোর্ড, ল্যাপটব, সি.ডি., মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

সফ্টওয়্যার ঃ কোন বিষয়ের কার্যক্রম পরিকল্পনা, পাঠ উপস্থাপনা, পাঠ্য বিষয়বস্তু, অডিও এবং ভিডিওতে ধারণকৃত বিষয়বস্তু, স্লাইডে ধারণকৃত ছবি, কাগজে অংকিত ছবি ও চিত্র এগুলো সফ্টওয়্যর। শিক্ষকের পারগতা, শিক্ষাদানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি এগুলোকেও সফ্টওয়্যার বলা হয়।

কাজেই পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিশ্বকে হতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। যে কোন খবর ও তথ্য বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে মুহূর্তের মধ্যেই সংগ্রহ করা যাচ্ছে। শুধু তাই নয় সিডির মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, শিখন শেখানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমনে বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে দ্রুত ও কম খরচে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা যাবে এবং আশানুরূপ শিক্ষামূলক ও প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা যাবে।

মূল্যায়ন:

১. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বলতে কী বোঝেন?

২. একজন শিক্ষক হিসাবে কোন কোন প্রযুক্তি আপনি ব্যবহার করেন এবং কীভাবে করেন?

৩. বাংলাদেশে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

সম্ভাব্য উত্তর:

পর্ব-ক, কাজ-১

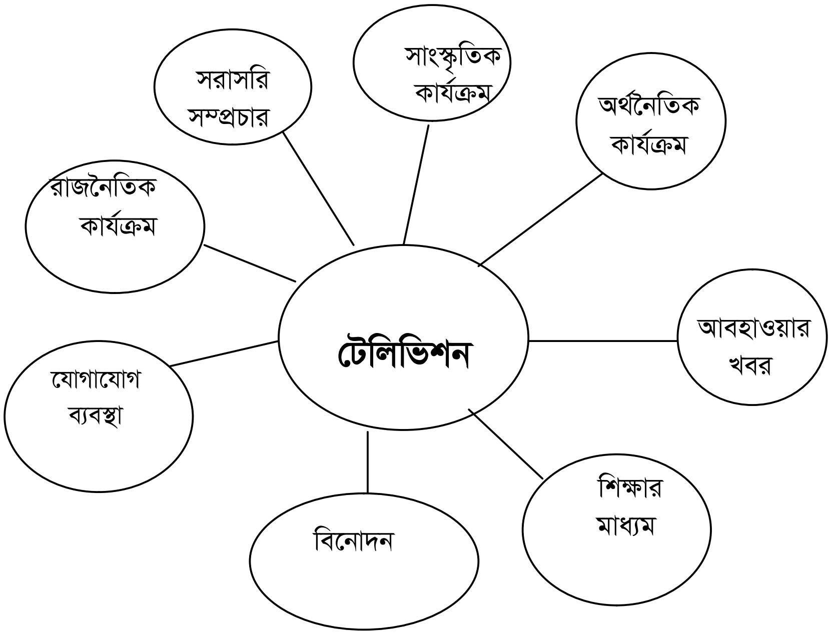
সরাসরি সম্প্রচার
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
অর্থনৈতিক কার্যক্রম
রাজনৈতিক কার্যক্রম
টেলিভিশন
আবহাওয়ার খবর
যোগাযোগ ব্যবস্থা
শিক্ষার মাধ্যম
বিনোদন

পর্ব-খ

কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-গ, কাজ-১

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

- নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ
- তুলনামূলক শিখন
- দক্ষতার উন্নয়ন
- উন্নত ও উন্নয়নশীল শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা